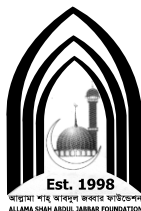


পবিত্র শবে কদর শবে বরাত ও শবে মি'রাজ

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে

মুহাম্মদ আবদুল আদিল আল-হাসান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: রবিউল আউওয়াল ১৪২১ হি. = জুন ২০০০ খ্রি.

দ্বিতীয় প্রকাশ: শাবান ১৪৩৬ হি. = জুন ২০১৬ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৩৭, বিষয় ক্রমিক: ০৩

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

আল-মানার লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

ছুফিয়া লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

মূল্য: ৮০ [আশি] টাকা মাত্র

Pobittro Shab-e-Qadr, Shab-e-Baraat o Shab-e-M'raj: By: Mohammad Abdul Hai Al Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 80

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

saajectg@yahoo.com

www.saaajbd.org

উৎসর্গ

আমার আববাজান-কে যিনি
জ্ঞানের আলোর মশাল হাতে
তুলে দিয়েছিলেন ।

সূচিপত্র

আবেদন ০৫

পবিত্র শবে কদর ০৭

শবে কদর বা লায়লাতুল কদরের অর্থ ১১

শবে কদর কোন রাত ১২

শবে কদরের তারিখ নির্ণয় ২২

পবিত্র শবে বরাত ২৪

লায়লাতুল বরাতে মানুষের রিয়ক বণ্টন হয় ৩৪

পবিত্র শবে বরাত ও শবে কদর উপলক্ষে উপদেশাবলি ৩৫

পবিত্র শবে মি'রাজ ৩৭

দৈহিক মি'রাজের প্রমাণাদি ৩৯

মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য ৪৪

ইসরা ও মি'রাজের তারিখ ৪৭

মসজিদ হারাম ও মসজিদ আকসা ৪৮

শবে মি'রাজের বিবরণ ৪৯

মি'রাজের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ৫৪

গ্রন্থপঞ্জি ৫৮

আবেদন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মহান আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ-কোটি শুকরিয়া যিনি তাঁর বান্দাকে সম্মানিত করার জন্য সম্মানিত রাত দান করেছেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অশেষ দরুদ ও সালাম যাঁর মাধ্যমে তাঁর উম্মতগণ অশেষ মর্যাদাবান রাতসমূহ লাভ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাগণের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ যে ৫টি মহামূল্যবান রাত দান করেছেন তাঁর মধ্যে শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ অন্যতম। বাকী দু'ঈদের দু'রাত। আমাদের আলোচ্য রাতগুলো হচ্ছে পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও মবে মি'রাজ। বাকী দু'ঈদের রাত নিয়ে পৃথক আর একটি পুস্তিকা রচনার আশা রয়েছে ইনশাআল্লাহ। মর্যাদাবান কোনো কিছুর মর্যাদা প্রদানের পূর্বে প্রয়োজন তার মর্যাদা, গুরুত্ব, মহত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে জানা।

পবিত্র শবে কদর এমন এক রজনী দুনিয়ার বুকে এ রাতের মতো মহামূল্যবান রাত আর নেই। এ পবিত্র রাতের মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে অবগত হওয়া আমাদের সাধ্যশক্তির বাইরে। এ রাতের গুরুত্ব ও মহত্ব অবগত করার জন্য আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেছেন।

আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির আর একটি রাত হচ্ছে শবে বরাত। এ রাতের মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে যারা ইবাদত করবে তারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে, সম্মানিতকে যারা সম্মান করবে সেও সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

আলোচ্য বিষয়ের আরেকটি রাত হচ্ছে শবে মি'রাজ। এ রাতের একটি বড় ইতিহাস রয়েছে। যথা- আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বারা যে বিরাট অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেছিলেন সেই বিখ্যাত ঘটনার রাতকে শবে মি'রাজ বলা হয়।

পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ ৬

উপর্যুক্ত পবিত্র ৩টি রাতের ফযীলত ও মর্যাদার প্রমাণাদি যথাসম্ভব কুরআন-হাদীস ও তাফসীর হতে নেওয়া হয়েছে। আর বর্ণিত হাদীস হতে যা নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীয়মান তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত কোনো হাদীস সম্পর্কে কারও মতভেদ থাকলেও ফযীলতের হাদীস বিধায় আমল করার অনুমতি রয়েছে।

পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের নিকট আরয এ পুস্তিকায় কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে সংশোধন করে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে মর্যাদাবান রাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে সে মতে আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

আরযগুয়ার

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী

০৬ জুন ২০০০

বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ
خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ نَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾ ﴾

‘নিশ্চয় আমি তা মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করেছি ।
আর তুমি কি জান যে, মহিমান্বিত রজনী কী? সহস্র মাস
অপেক্ষা উত্তম । উক্ত রজনীতে ফেরশতাগণ ও হযরত
জিবরীল (আ.) তাঁদের প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক
কাজের জন্য অবতীর্ণ হন । তা প্রভাতের প্রকাশ পর্যন্ত
শান্তিপ্রদ ।’

সূরা আল-কদর

পবিত্র শবে কদর

হিজরী বর্ষের নবম মাস রমযান। এ মাসের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা ও মরতবার অন্যতম কারণ হচ্ছে, এ মাসেই পুণ্যময় পবিত্র শবে কদর প্রচ্ছন্ন রয়েছে। দুনিয়ার বুকে এ রাতের ন্যায় মহামূল্যবান রাত আর নেই। এ রাতের ফযীলত পরিপূর্ণভাবে অবগত হওয়া মানুষের সাধ্য-শক্তির বাইরে। এ রাতের গুরুত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে অবগত করার জন্য মহান দয়াময় আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ করেছেন।

شب (শব) ফারসি শব্দ, আরবিতে لَيْلَةٌ (লায়লা) বলে, অর্থ রজনী। لَيْلَةُ الْقَدْرِ (লায়লাতুল কদর) অর্থ: মহিমান্বিত রাত। الْقَدْرُ (কদর) শব্দের ধাতুগত অর্থ পরিমাণ, নিরূপণ ও নির্ধারণ। কিন্তু সূরা আল-কদর-এ এটি সম্মান, গৌরব, মর্যাদা ও মহিমা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা লায়লাতুল কদরের ফযীলত বর্ণনার উদ্দেশ্যে সূরা আল-কদর অবতীর্ণ করেছেন। উক্ত রাত সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ

‘লায়লাতুল কদর হাজার মাস হতে উৎকৃষ্ট।’^১

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا أَرْبَعَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ عَبْدُ اللَّهِ ثَمَانِينَ عَامًا، لَمْ يَعْصُوهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَذَكَرَ أَيُّوبَ وَرَكَرِبًا وَحَزَقِيلَ بْنَ الْعَجُوزِ وَيُوشَعَ بْنَ نُونٍ، قَالَ: فَعَجِبَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! عَجِبْتُ أَمَّتَكَ مِنْ عِبَادَةٍ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-কদর, ৯৭:৩

تَمَّانَيْنِ سَنَةً لَمْ يَعْصَوْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَقَدْ أُنْزِلَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝﴾ [الفدر] هَذَا أَفْضَلُ مِمَّا عَجِبْتَ أَنْتَ وَأَمْتُكَ: فَسَرَّ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ.

একদিন হুযুর (সা.) সাহাবাগণের সম্মুখে ইসরায়েলীর ৪ ব্যক্তির সম্পর্কে আলোচনা করলেন যে, তাঁরা ৮০ বছরেরও বেশি সময় ধরে একাধিকক্রমে ইবাদত করেন। এ সময়ের মধ্যে একটা নাফরমানিও তাঁরা করেননি। তারপর হযরত আইয়ুব (আ.), হযরত যাকারিয়া (আ.), হযরত হিয়কীল ইবনুল আজ্জ (আ.) ও হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ.) এ ৪জন পয়গাম্বরের কথাও উল্লেখ করেন। হুযুর (সা.)-এর পবিত্র যবানে তা শুনে পেয়ে তারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়লেন। কেননা পূর্ববর্তী যুগে ধার্মিকগণ দীর্ঘায়ু লাভ করে আল্লাহ তাআলার যত উপাসনা-ইবাদত করেছেন এবং যত পুণ্যের অধিকারী হয়েছেন তা বর্তমান ও ভবিষ্যত যুগে অল্পাধু ধর্মপ্রাণদের পক্ষে কি করে সম্ভব হবে? এমন সময় হযরত জিবরীল (আ.) হুযুর (সা.)-এর খিদমতে আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার চেয়েও বিস্ময়কর বস্তু আল্লাহ তাআলা আপনার উম্মতদেরক দান করেছেন। অতঃপর তিনি সূরা আল-কদর পাঠ করে শোনালেন,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

‘নিশ্চয় আমি তা মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। আর তুমি কি জান যে, মহিমান্বিত রজনী কী? সেই মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। উক্ত রজনীতে ফেরেশতাগণ ও হযরত জিবরীল (আ.) তাঁদের প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক কাজের জন্য অবতীর্ণ হয়। তা প্রভাতের প্রকাশ পর্যন্ত শান্তিপ্ৰদ।’^১

ইমাম ইবনে আবু হাতিম (রহ.) বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত তাবিয়ী ইমাম মুজাহিদ ইবনে জবর (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে,

^১ ইবনে আবু হাতিম, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ১০, পৃ. ৩৪৫২, হাদীস: ১৯৪২৬

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَبَسَ السَّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَلْفَ شَهْرٍ، فَعَجِبَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ، فَتَنَزَّلَتْ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ
الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ﴾ [القدر] النَّبِيُّ
لَبَسَ ذَلِكَ الرَّجُلُ السَّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِيهَا.

‘রাসূল (সা.) একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। যিনি এক হাজার মাস অবিরাম জিহাদে মশগুল ছিলেন, কখনও অস্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ একথা শুনে বিস্মিত হলেন, তখন সূরা আল-কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে শুধু এক রাতের ইবাদতই ওই মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে।’^১

ইমাম ইবনে জরীর আত-তাবারী (রহ.) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يَقُومُ اللَّيْلَ حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ
يُجَاهِدُ الْعَدُوَّ بِالنَّهَارِ حَتَّى يُمْسِيَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ أَلْفَ شَهْرٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ
الْآيَةَ: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ﴾ [القدر] «قِيَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ خَيْرٌ مِنْ
عَمَلِ ذَلِكَ الرَّجُلِ».

‘ইমাম মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি পুরো রাত ইবাদতে মশগুল থাকত এবং সকাল হতেই জিহাদের জন্যে বের হয়ে যেত আর সারাদিন জিহাদে লিপ্ত থাকত; এভাবে সে এক হাজার মাস কেটে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা সূরা আল-কদর নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।’^২

^১ (ক) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাফসীরুল মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ৩১০; (খ) ইবনে আবু হাতিম, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ১০, পৃ. ৩৪৫২, হাদীস: ১৯৪২৪; (গ) আল-ওয়াহিদী, আসবাবু নুযুলিল কুরআন, পৃ. ৪৮৬, হাদীস: ৮৬৪; (ঙ) মুজাহিদ, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, পৃ. ৭৪০

^২ (ক) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাফসীরুল মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ৩১০; (খ) আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন, খ. ২৪, পৃ. ৫৬৪

এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, শবে কদর উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।^১

শবে কদর বা লায়লাতুল কদরের অর্থ

কদরের এক অর্থ: মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এ স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে এটিকে লায়লাতুল কদর তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-ওয়াররাক (রহ.) বলেন,

سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَدْرٌ وَلَا خَطَرٌ يَصِيرُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ذَا قَدْرٍ
إِذَا أَحْيَاهَا.

‘এ রাতকে লায়লাতুল কদর বলার কারণ হচ্ছে, আমল না করার কারণে এর পূর্বে যার কোনো সম্মান ও মূল্য মহিমান্বিত থাকেন না এ রাতে তওবা-ইসতিগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিতও হয়ে যায়।’^২

কদরের আরেক অর্থ: তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিয়ক ও বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেওয়া হয়। এমনকি এ বছর কে হজ্জ করবে তাও লিখে দেওয়া হয়। ৪জন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয় তাঁরা হলেন হযরত ইসরাফীল (আ.), হযরত মীকায়ীল (আ.), হযরত আযরায়ীল (আ.) ও হযরত জিবরীল (আ.)।^৩

আল্লাহ তাআলা কুরআনের অন্যত্র বলেছেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَرَّكَ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْرًا ۝
عِنْدَنَا ۝

‘আমি একে নাযিল করেছি। এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়। আমার

^১ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১৪৬৬-১৪৬৭

^২ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২০, পৃ. ১৩০-১৩১

^৩ (ক) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১৪৬৭; (খ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২০, পৃ. ১৩০

পক্ষ থেকে আদেশক্রমে।^১

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র রাতে তকদীর-সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে, **كُلُّ شَيْءٍ**-এর অর্থ: শবে কদরই। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্য শাবানের রাত অর্থাৎ শবে বরাত।^২ তাঁরা বলেন যে, তকদীর-সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রাথমিক ও সংরক্ষিত ফয়সালা শবে বরাতেই হয়ে যায়। অতঃপর তার বিশদ বিবরণ শবে কদরে লিপিবদ্ধ হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বক্তব্যে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম আবু মুহাম্মদ আল-বগওয়ী (রহ.)-এর রিওয়ায়েতে তিনি বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، أَنَّ اللَّهَ يَقْضِي الْأَقْضِيَةَ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَيُسَلِّمُهَا إِلَى أَرْبَابِهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা সারা বছরের তকদীর-সংক্রান্ত বিষয়াদির ফয়সালা শবে বরাতে সম্পন্ন করেন। অতঃপর শবে কদরে সেসব ফয়সালা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়।’^৩

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ রাতে তকদীর-সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে সেসব লওহে মাহফুয হতে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধি-লিপি আদিকালেই লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে।^৪

শবে কদর কোন রাত

কুরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে কদর রমযান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলেমগণের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়, যা সংখ্যায় ৪০ পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাফসীরে *মায়হারী*-এ আছে, এসব মতামতের মধ্যে নির্ভুল তথ্য হচ্ছে, শবে কদর রমযান মাসের শেষ দশ

^১ আল-কুরআন, *সূরা আদ-দুখান*, ৪৪:৩-৫

^২ (ক) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মায়হারী*, খ. ৮, পৃ. ৩৬৭; (খ) আল-বগওয়ী, *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ১৭২

^৩ (ক) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মায়হারী*, খ. ৮, পৃ. ৩৬৮; (খ) আল-বগওয়ী, *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪

^৪ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১৪৬৭

১৩ পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ

দিনের মধ্যে আছে, কিন্তু এরও কোনো তারিখ নির্দিষ্ট নেই। বরং যেকোনো রাতে হতে পারে, প্রত্যেক রমযানে তা পরিবর্তিতও হয়।^১

সহীহ হাদীস দৃষ্টে ১০ দিনের বিজোড় রাতগুলোতে শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শবে কদরকে রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে ঘূর্ণয়মান এবং প্রতি রমযানে পরিবর্তনশীল মেনে নেওয়া হয়, তবে শবে কদরের দিন-তারিখ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিয়ী (রহ.)-এর এক বক্তব্য অনুসারে শবে কদর নির্দিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে।^২

সহীহ আল-বুখারীর এক রিওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.»

‘রমযানের শেষ দশকে শবে কদর অন্বেষণ কর।’^৩

সহীহ মুসলিম-এর রিওয়ায়েতে আছে,

«فَاطْبُؤْهَا فِي الْوَيْتْرِ مِنْهَا.»

‘শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে তালাশ কর।’^৪

﴿اِنَّهُۥٓ اَتَتْهُۥ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ এ আয়াত হতে পরিষ্কার জানা যায় যে, কুরআন পাক শবে কদরে অবতীর্ণ হয়েছে।

এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কুরআন লওহে মাহফুয হতে শবে কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ.) তা ধীরে ধীরে ২৩ বছর ধরে রাসূল (সা.)-এর কাছে পৌছাতে থাকেন।

দ্বিতীয়ত এও হতে পারে যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে কুরআন অবতরণের ধারাবাহিকতা সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কুরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়েছে।^৫

^১ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, খ. ১০, পৃ. ৩১২

^২ (ক) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১৪৬৭; (খ) ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৮, পৃ. ৪৩২

^৩ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪৭, হাদীস: ২০২০, হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৪ (ক) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, খ. ১০, পৃ. ৩১৪; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮২৩, হাদীস: ২০৮ (১১৬৫), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৫ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১৪৬৭

সকল আসমানী কিতাব রমযানেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ মর্মে হাদীসে এসেছে যে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ ؑ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مَضِيَّاتٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَيُرَوَّى فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتْ تَوْرَاهُ مُوسَى ؑ فِي سِتِّ لَيَالٍ مَضِيَّاتٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْإِنْجِيلُ عَلَى عِيسَى ؑ فِي ثَلَاثِ عَشْرَةِ لَيْلَةٍ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ رُبُورُ دَاوُدَ فِي ثَمَانِ عَشْرَةِ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الْفُرْقَانُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فِي الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْسَتْ بِثَلَاثٍ بَقِيْنَ بَعْدَهَا».

‘হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) বর্ণিত রিওয়াযতে রাসূল (সা.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাসমূহ ৩ রমযানে, তওরাত ৬ রমযানে, ইনজীল ১৩ রমযানে এবং যবুর ১৮ রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন পাক ২০ রমযানুল মুবারক নাযিল হয়েছে।’^১

تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالْوُحُوتِ; এখানে বলে হযরত জিবরীল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। হাদীসে আছে,

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ فِي كَبَكَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ؛ يُصَلُّونَ وَيَسْلُمُونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ ﷻ».

‘হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘শবে কদরে হযরত জিবরীল (আ.) ফেরেশতাদের বিরাট একটি দল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং যত নারী-পুরুষ নামায অথবা যিকরে মশগুল থাকেন তাঁদের জন্য রহমতের দু'আ করেন।’^২

অর্থাত্ ফেরেশতাগণ শবে কদরে সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলি নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোনো কোনো তফসীরবিদ এটিকে

^১ (ক) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাফসীরুল মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ৩১১-৩১২; (খ) আল-বগওয়ী, মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ২১৭, হাদীস: ১৩৭

^২ (ক) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাফসীরুল মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ৩১৫; (খ) ইবনুল জওয়ী, যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর, খ. ৪, পৃ. ৪৭৩, হাদীস: ১৫৫৯

১৫ পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ

ﷺ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এ রাতটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শান্তিরূপ।^১

ﷺ অর্থাৎ এ রাত শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের নামও নেই।^২

কেউ কেউ একে مِنْ كُنْ أَمْرًا-এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন, ফেরেশতাগণ প্রত্যেকে শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে।^৩

حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ অর্থাৎ শবে কদরের এ বরকত রাতের কোনো বিশেষ অংশে সীমিত নয়, বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।^৪

পবিত্র কালামে উল্লেখিত মহিমান্বিত রজনী (লায়লাতুল কদর) হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অর্থাৎ যারা এ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবেন তারা হাজার মাসে সমৃদ্ধ একটি পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবনের ইবাদতের অথও সওয়াবের অধিকারী হবে (এক হাজার মাসে ৮৩ বছর ৪ মাস)। নবীজি (সা.) তা শুনে আনন্দিত হলেন। আমাদের দেশে এ রাত সাধারণত শবে কদর নামে পরিচিত।

লায়লাতুল কদরের ফযীলত সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

‘হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘যারা দৃঢ় বিশ্বাসে সওয়াবের আশায় লায়লাতুল কদরে ইবাদত করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের অতীতের সমস্ত গোনাহ (সগীরা) মাফ করে দেবেন।’^৫

আরও একটি হাদীসে আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন,
«مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

^১ (ক) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১৪৬৭; (খ) ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৮, পৃ. ৪২৮

^২ (ক) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১৪৬৭; (খ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২০, পৃ. ১৩৪

^৩ (ক) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১৪৬৭; (খ) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, খ. ১০, পৃ. ৩১৫

^৪ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ১৪৬৭

^৫ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ২৬, হাদীস: ১৯০১

‘যারা শবে কদরে ইবাদত করতে পেরেছেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাঁদের মর্যাদা বুলন্দ করবেন।’

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে,

‘যারা শবে কদরে ইবাদত করেছেন দোযখের আগুন তাঁদের জন্য হারাম হয়েছে।’

হযুর (সা.) বলেছেন,

‘আল্লাহ তাআলা শবে কদর দ্বারা রাতসমূহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। অতএব তোমরা এ রাতে ইবাদত কর। কেননা এটি সর্বশ্রেষ্ঠ রাত।’

তিনি আরও বলেছেন,

‘যদি তোমরা তোমাদের কবরকে আলোকময় পেতে চাও তবে শবে কদরে জাগ্রত থেকে ইবাদত কর।’

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ اللَّهُ ﷻ جِبْرِيلَ ﷺ أَنْ يَنْزِلَ إِلَى الْأَرْضِ وَمَعَهُ سُكَّانُ سِدْرَةِ الْمُتَهَيَّ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، وَمَعَهُمْ أَلَوِيَّةٌ مِنْ نُورٍ، فَإِذَا هَبَطُوا إِلَى الْأَرْضِ رَكَزَ جِبْرِيلُ ﷺ لِرِوَاءِ الْمَلَائِكَةِ أَلَوِيَّتَهُمْ فِي أَرْبَعِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَعِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعِنْدَ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَعِنْدَ مَسْجِدِ طُورِ سَيْنَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ جِبْرِيلُ ﷺ تَفَرَّقُوا، فَيَتَفَرَّقُونَ، فَلَا تَبْقَى دَارٌ وَلَا حُجْرَةٌ وَلَا بَيْتٌ وَلَا سَفِينَةٌ فِيهَا مُؤْمِنٌ أَوْ مُؤْمِنَةٌ إِلَّا دَخَلَتْ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا، إِلَّا بَيْتَ فِيهِ كَلْبٌ أَوْ خِنْزِيرٌ أَوْ خَمْرٌ أَوْ جُنُبٌ مِنْ حَرَامٍ أَوْ صُورَةٌ، فَيَسْبَحُونَ وَيُقَدِّسُونَ وَيُهَلِّلُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَقْتُ الْفَجْرِ يَصْعَدُونَ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَسْتَقِيلُهُمْ سُكَّانُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُونَ لَهُمْ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا فِي الدُّنْيَا، لِأَنَّ الدَّلِيلَةَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لِأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَقَالَ سُكَّانُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِحَوَائِجِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَصَالِحِيهِمْ وَشَفَعَهُمْ فِي صَالِحِيهِمْ، فَتَرْفَعُ مَلَائِكَةُ سَّمَاءِ الدُّنْيَا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّائِبِ عَلَى رَبِّ

الْعَالَمِينَ شُكْرًا لِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّضْوَانِ، ثُمَّ تَشْيِعُهُمْ مَلَائِكَةُ سَمَاءِ الدُّنْيَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ كَذَلِكَ سَمَاءٍ بَعْدَ سَمَاءٍ إِلَى السَّابِعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ جِبْرِيلُ ﷺ: يَا سُكَّانَ السَّمَوَاتِ ارْجِعُوا، فَتَرْجِعُ مَلَائِكَةُ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى مَوَاضِعِهِمْ، وَيَرْجِعُ سُكَّانُ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى إِلَى السِّدْرَةِ، فَيَقُولُ سُكَّانُ السِّدْرَةِ: أَيْنَ كُنْتُمْ؟ فَيَجِيبُونَ مِثْلَ مَا أَجَابُوا أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَتَرْفَعُ سُكَّانُ السِّدْرَةِ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ، فَتَسْمَعُ جَنَّةُ الْمَأْوَى، ثُمَّ جَنَّةُ النَّعِيمِ، ثُمَّ جَنَّةُ عَدْنٍ، ثُمَّ الْفِرْدَوْسِ، فَيَسْمَعُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، فَيَرْفَعُ الْعَرْشُ صَوْتَهُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالثَّنَاءِ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ شُكْرًا لِمَا أَعْطَى هَذِهِ الْأُمَّةَ.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, লায়লাতুল কদরে আল্লাহ পাক হযরত জিবরীল (আ.)-কে বলেন, ‘সিদরাতুল মুনতাহার সমস্ত ফেরেশতাকে সাথে নিয়ে পৃথিবীতে যাও।’ নির্দেশ মতো ৭০ হাজার ফেরেশতা নূরের পতাকা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন। তাঁরা কা’বা ঘরের নিকট, হুযর (সা.)-এর রাওযা পাকের নিকট, বায়তুল মাকদিস এবং তুরে সীনায়—এ ৪ স্থানে তাদের পতাকা প্রোথিত করেন। অতঃপর বাকী সব ফেরেশতা হযরত জিবরীল (আ.)-এর আদেশক্রমে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন। প্রত্যেকটি ঘর ও স্থানে যেখানেই কোনো ঈমানদার নর-নারী থাকেন, সেখানে তাঁরা উপস্থিত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতদের গোনাহ মার্জনার জন্য দুআ করেন এবং ইবাদতে মশগুল থাকেন। কিন্তু যে ঘরে বা স্থানে কুকুর, গুয়ার, মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারী স্ত্রী-পুরুষের অবস্থান কিংবা প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে বা স্থানে প্রবেশ করেন না। সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে সালাম ও মুসাফাহা করে থাকেন এবং প্রত্যেককে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রভাত পর্যন্ত সালাম ও জাগ্রত মুমিন বান্দাদের সাথে দুআয় শামিল হয়ে ‘আমীন’-‘আমীন’ বলতে থাকেন। এতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা এত সন্তুষ্ট হন যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে গৌরব অনুভব করেন এবং অত্যাধিক খুশি হয়ে ইবাদতকারীর সমস্ত গোনাহ (সগীরা) ক্ষমা

করে দেন। অতঃপর রজনী প্রভাতের সাথে সাথে সেসব ফেরেশতা আকাশে চলে যান। যখন আসমানের ফেরেশতাগণ উম্মতে মুহাম্মদীর গোনাহ মাফের কথা শুনতে পান, তখন তাঁরাও আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ও মহানুভবতা বর্ণনা করে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন। এ আনন্দোচ্ছ্বাস সমস্ত বেহেশত এমনকি আল্লাহ তাআলার আরশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে এবং এতে আল্লাহ তাআলা অন্যন্ত গৌরব অনুভব করেন।^১

বর্ণিত আছে,

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَيَّنَ اللَّيْلَ لِبَيْتَةِ الْقَدْرِ».

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শবে কদর দ্বারা রাতসমূহের শোভা বর্ধন করেছেন।’

অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘যে মুমিন ব্যক্তি নেকী ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে শবে কদরে দণ্ডায়মান হয় (অর্থাৎ নামায আদায় করে) তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।’^২

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

‘যে ব্যক্তি কদরের রাতকে জীবিত রাখে (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সারা রাত ইবাদত করে) সে ১০০ বছরের ইবাদতের সওয়াব লাভ করবে।’

এর কারণ হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা শবে কদরকে একটু লুকিয়ে রেখেছেন, বান্দা যেন তা তালাশ করার আগ্রহ করে। অর্থাৎ প্রেমিকের মতো তার অনুসন্ধান করে।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি শবে কদরকে জীবিত রাখে অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত করে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাঁর অন্তর জীবিত রাখবেন এবং তাঁর সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’

^১ আল-জিলানী, আল-গুনয়াতু লি-তালিবায তরীকিল হক আযযা ওয়া জাল্লা, খ. ২, পৃ. ২২-২৩

^২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ২৬, হাদীস: ১৯০১

অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ النِّسَاءِ مَرِيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'রাতসমূহের মধ্যে শবে কদরই সর্বোত্তম।'^১

অর্থাৎ এই রাতের ইবাদতে যত অধিক সওয়াব হয় তত আর কোনো রাতে হয় না।

হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ২৭ রমযান রাতে জাহাজে চড়ে সাগর ভ্রমণে গিয়েছিলাম। ঘটনাক্রমে যখন আমি সাগর হতে সামান্য পানি উঠিয়ে মুখে দেই। তা আমার নিকট অতিশয় মিষ্ট মনে হল। আর হঠাৎ আমাদের জাহাজের গতি রহিত হয়ে গেল। তখন আমরা নিকটবর্তী দ্বীপের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার সমস্ত গাছ-পালা মাথা নুইয়ে সিজদায় পড়ে আছে।

হযরত শায়খ আবদুল কাদের আল-জিলানী (রহ.)-রচিত গুনিয়া/তুত তালিবীন গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ جِبْرِيلُ ﷺ، فَيَهْبِطُ فِي كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَمَعَهُ لَوَاءٌ أَخْضَرُ إِلَى الْأَرْضِ، فَيَرْكُزُهُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، وَلَهُ سِتْنَاءُ جَنَاحٍ، لَا يَنْشُرُهَا إِلَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَيَنْشُرُهَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَيَجَاوِزُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ، وَيَبِثُّ جِبْرِيلُ ﷺ الْمَلَائِكَةَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَيَسَلُّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ، مُصَلٍّ وَذَاكِرٍ، وَيُصَافِحُوهُمْ وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ يَنَادِي جِبْرِيلُ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ! الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ، فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ! مَا صَنَعَ اللَّهُ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّةٍ أَحْمَدَ ﷺ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَظَرَ إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَعَفَا عَنْهُمْ وَعَفَرَ لَهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً، فَقَالَ

^১ আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, খ. ২, পৃ. ১৬৫, হাদীস: ৩০০৫

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُؤَلَاءِ الْأَرْبَعَةُ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَعَاقٌ وَالِدَيْهِ، وَقَاطِعٌ رَحِمٍ،
وَمُشَاجِرٌ».

‘কদরের রাতে আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা জিবরীল (আ.) বহু ফেরেশতা নিয়ে দুনিয়ায় নেমে আসেন। সে সময় প্রত্যেক ফেরেশতার সাথে একটি করে সবুজ রঙ্গের নিষা থাকা এবং ফেরেশতা হযরত জিবরীল (আ.) ৬০০ পাখা দ্বারা সজ্জিত থাকেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ.) ডেকে বলেন, হে বন্ধুগণ! এখন তোমরা চলে যেতে পার। তখন তাঁরা হযরত জিবরীল (আ.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, হে আমাদের নেতা হযরত জিবরীল (আ.)! বলুন তো, উম্মতে মুহাম্মদী (সা.)-এর প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করলেন কি-না? উত্তরে হযরত জিবরীল (আ.) বলেন, বন্ধুগণ শোন! আল্লাহ তাদের মুনাজাতকালে তাঁদের প্রতি ৭০বার দৃষ্টি করেন এবং তাঁদের সমস্ত গোনাহ মার্জনা করে দেন। তবে ৪ প্রকার লোককে আল্লাহ মার্জনা করবেন না। সে ৪ প্রকার লোকের পরিচয় হযরত রাসূল করীম (সা.) বলে দিয়েছেন। যথা—

১. যারা সদা-সর্বদা মদ্যপান করে,
২. যারা পিতা-মাতার অনুগত নয়,
৩. যারা আত্মীয় স্বজনের সাথে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বর্জন করে এবং
৪. যারা মুমিন মুসলিম ভাইদের সাথে অহেতুকভাবে শত্রুতা পোষণ করে।^১

শবে কদরের নিদর্শন সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,
‘যেদিন প্রকৃতই শবে কদর হয় সেদিন রাতে আসমান হতে লাখ লাখ ফেরেশতা নাযিল হয়ে শবে কদরের ইবাদকারীদের সাথে মুসাফাহা করেন। এ মুসাফাহা অবশ্য ইবাদকারী বান্দাগণ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে পারেন না, তবে তাদের মুসাফাহার নিশানা হচ্ছে, সে সময় তাঁদের অন্তঃকরণ অত্যন্ত আনন্দিত মনে হয়। তা ছাড়া তাদের চক্ষু হতে খুশির অশ্রু নির্গত হয় এবং আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ ও মুহব্বতের বেগ বৃদ্ধি পায়।’^২

^১ (ক) আল-জিলানী, *আল-গুনয়াতু লি-তালিবায তরীকিল হক আযযা ওয়া জাল্লা*, খ. ২, পৃ. ১১-১২;

(খ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ইমান*, খ. ৫, পৃ. ২৭৭, হাদীস: ৩৪২১, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ ইবনে আবু হাতিম, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ১০, পৃ. ৩৪৫৩, হাদীস: ১৯৪২৮:

জেনে রাখবে সেই সময়টা দু'আ কবুলের সময়। এ বর্ণনার সাথে বহু বুয়ুর্গানে দীন একমত হয়েছেন।

হাদীস শরীফে আছে,

‘যারা শবে কদরের ইবাদতের নিয়তে সন্ধ্যায় গোসল করবে তাদের পা ধোয় শেষ না হতেই পূর্বের (সগীরা) সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।’

সন্ধ্যায় গোসল করার পর তাহিয়াতুর ওয়ুর নিয়তে দু'রাকআত নামায আদায় করবে। নিয়ত ও তাকীবর তাহরীমার পর بِسْمِ اللَّهِ, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ ও সূরা আল-ফাতিহার পর প্রত্যেক রাকআতে সূরা আল-কদর একবার ও সূরা আল-হাশরের শেষ ৩ আয়াত একবার পড়বে। তারপর ইশার নামাযান্তে শবে কদরের নিয়তে দু'রাকআত নফল নামায আদায় করবে। উভয় রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার পর একবার সূরা আল-কদর এবং ৩বার সূরা আল-ইখলাস পাঠ করবে। অতঃপর দু'রাকআত করে ৪ রাকআত নফল নামায আদায় করবে। প্রত্যেক রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার পর সূরা আল-কদর একবার এবং সূরা আল-ইখলাস ২৭ বার করে পড়বে।

হাদীস শরীফে আরও আছে,

‘যারা এ নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন নিষ্পাপ করে দেবেন যেমন- আজই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছে। আর তাঁদের জন্য বেহেশতে অতি-উত্তম স্থান দান করবেন। অর্থাৎ অত্যধিক সওয়াব দান করবেন।’

এরপর দু'রাকআত করে ৪ রাকআত নামায আদায় করবেন। প্রত্যেক রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার পরে সূরা আল-কদর ৩বার ও সূরা আল-ইখলাস ৫০ বার পড়বে। ৪ রাকআত শেষ করে সিজদায় গিয়ে নিম্নোক্ত দু'আ ৪০ বার পড়বে, وَاللّٰهُ اَكْبَرُ, سُبْحَانَ اللَّهِ, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَاللَّهُ أَكْبَرُ।

হাদীস শরীফে আছে,

‘যারা এ নামায আদায় করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের সমস্ত গোনাহ (সগীরা) মাফ করে দেবেন এবং তাঁদের দু'আ আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়ে যাবে।’

শবে কদরের তারিখ নির্ণয়

লায়লাতুল কদর রমযানের ২৭ তারিখ বা ২০ তারিখ দিবাগত রাত হতে ২৯ তারিখের মধ্যে বিদ্যমান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা হুযুর (সা.) থেকে লায়লাতুল কদরের সময় সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «تَحْرُوُ اللَّيْلَةَ الْقَدْرَ فِي الْوَتْرِ، مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

‘হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণি, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমরা লায়লাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতসমূহের তালাশ কর।’^১

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর।’^২

অন্য হাদীসে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের কথাও উল্লেখ আছে।

লায়লাতুল কদরকে তালাশ করার অর্থ তার সম্ভাব্য তারিখে যথাসাধ্য ইবাদত-বন্দেগি করে রাত যাপন করা যেন প্রকৃত লায়লাতুল কদরের ফযীলত হতে হুযুর (সা.)-এর প্রিয় উম্মতগণ বঞ্চিত না হন।

নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তবে একটি হাদীসে জানা যায় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, ‘রমযানের ২৭ তারিখেই লায়লাতুল কদর জানিও।’

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, শবে কদর সম্পর্কে আমি বিজোড় সংখ্যার মধ্যে চিন্তা করে দেখলাম, ৭ সংখ্যাই অধিক প্রযোজ্য অর্থাৎ ২৭ তারিখ।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, রমযানের ২৭ তারিখেই শবে কদর। তার একটি সুস্পষ্ট হিসাব হচ্ছে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)

^১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৭, হাদীস: ২০২০

^২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৭, হাদীস: ২০২১

২৩ পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ

বলেন, যে সময় সমস্ত কুরআন ফেরেশতাদের জিম্মায় রাখা হয়েছিল তা লায়লাতুল কদর ছিল। আর কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, লায়লাতুল কদর রমযান মাসেই আছে। তাছাড়া لَيْلَةُ الْقَدْرِ (লায়লাতুল কদর) শব্দটির মধ্যে ৯টি অক্ষর রয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা উক্ত শব্দটি ৩বার উল্লেখ করেছেন। অতএব ৯-কে ৩ দ্বারা গুণ করলে $৯ \times ৩ = ২৭$ হয়, কাজেই লায়লাতুল কদর ২৭ রমযান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এ সূক্ষ্ম অনুসন্ধানটি অধিকাংশ আলিম ও মুহাদ্দিস সমর্থন করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

«إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِعُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي؟ فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مُسْتَزِرٌّ؟ فَأَرْزُقْهُ، أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ».

‘শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতের আগমন হলে তোমরা রাত জেগে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হও এবং দিনের বেলায় রোযা পালন কর। কেননা মহান আল্লাহ সেদিন সূর্যাস্তের পর পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হয়ে বলেন, কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী কি আছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কোনো রিয়কপ্রার্থী কি আছে? আমি তাকে রিয়ক দেবো। কোনো বিপদগ্রস্থ কি আছে? আমি তাকে বিপদমুক্ত করবো।’

হযরত রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مَنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كَلْبٍ».

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের মধ্য রাতে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং বনী কলবের ছাগল পালের লোমের চেয়ে অধিক সংখ্যক লোককে ক্ষমা করে দেন।’

পবিত্র শবে বরাত

আরবি বছরের অষ্টম মাস হল শাবান, এ মাসের ফযীলত ও বরকত অন্যান্য মাসের তুলনায় এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ মাসে এমন একটি পবিত্র রাত রয়েছে যার মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র হাদীসে বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। এ মাসে ঈমানদারগণের সংহত ত্যাগ, আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনের সবক দিয়ে যায়। যার সুষ্ঠু প্রতিফলন পবিত্র রমযান মাসের মাধ্যমে পরিপূর্ণরূপে ঘটিয়ে থাকে। শবে বরাতের অমূল্য স্মৃতিকে বুকে ধারণা করেছে বলেই শাবান মাসের মর্যাদা উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».

‘হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, রজব মাস আগমন করলে নবী করীম (সা.) নিম্নের দুআটি বেশি পাঠ করতেন,
«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ»^১

لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ (শব) ফারসি শব্দ, আরবিতে لَيْلَةٌ (লায়লা) অর্থ: রাত। (লায়লাতুল বরাত) অর্থ: বণ্টনের রাত। শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে লায়লাতুল বরাত বলা হয়। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের ফযীলত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যে কতগুলি উপকরণ দান করেছেন তার মধ্যে উক্ত রাত অন্যতম। এ রাতের মর্যাদা ও ফযীলতের প্রতি লক্ষ্য রেখে যারা আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকেন তারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। চিরাচরিত নিয়মও রয়েছে যে, সম্মানিতকে তার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে যে সম্মান করে সেও সম্মানিত হয় এবং মর্যাদার অধিকারী হয়। যেমন— উক্ত রাত সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে,

^১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪৭, হাদীস: ২০২১

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِلْغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي؟ فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٌ؟ فَأَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلًى فَأَعَافِيَهُ، أَلَا كَذَّاءً أَلَا كَذَّاءٌ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

‘হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতের আগমন হলে তোমরা রাত জেগে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হও এবং দিনের বেলায় রোযা পালন কর। কেননা মহান আল্লাহ সেদিন সূর্যাস্তের পর পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হয়ে বলেন, কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী কি আছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কোনো রিয়কপ্রার্থী কি আছে? আমি তাকে রিয়ক দেবো। কোনো বিপদগ্রস্থ কি আছে? আমি তাকে বিপদমুক্ত করবো। এভাবে ভোর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা অব্যাহত থাকে।’^১

عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللَّهُ ﷻ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ لِأَخِيهِ».

‘হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘শাবানের মধ্যবর্তী রাতের আগমন হলে আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তবে যেসব লোক আল্লাহর সাথে শিরক করে কিংবা আপনা ভাইয়ের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে তাকে ক্ষমা করেন না।’^২

বর্ণিত আছে,

«طُوبَى لِمَنْ يَعْمَلُ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ خَيْرًا».

‘যে ব্যক্তি শাবানের চাঁদের পনের তারিখ রাতে ইবাদত করবে তারই সৌভাগ্য ও তাঁর জন্যই সন্তোষ।’

^১ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৪৪৪, হাদীস: ১৩৮৮

^২ আল-বায়হার, আল-মুসনদ, খ. ১, পৃ. ১৫৭, হাদীস: ৮০

এ রাতের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে,
‘যারা এই রাতে ইবাদত করবে আল্লাহ তাআলা আপন খাস রহমত
ও অনুগ্রহের দ্বারা তাদের জন্য দোযখের অগ্নিকে হারাম করে
দেবেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে,
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النُّصْفِ مِنْ
شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كُلِّ».

‘হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)
বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের মধ্য রাতে প্রথম
আসমানে অবতরণ করেন এবং বনী কলবের ছাগল পালের লোমের
চেয়ে অধিক সংখ্যক লোককে ক্ষমা করে দেন।’^১

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে অত্যাধিক মার্জনা করবেন।
উক্ত বংশের নাম এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, তারা সকলের নিকট সুপরিচিত
ছিল এবং তাদের ভেড়া-বকরী অত্যাধিক ছিল।

হযুর (সা.) স্বয়ং উক্ত রাতের অত্যাধিক মর্যাদাহেতু সারা রাত আল্লাহ
তাআলার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। হযুর (সা.)-এর পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ
মাফ বা তিনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ থাকা সত্ত্বেও যখন লায়লাতুল বরাত আসত
তখন উক্ত রাতের অধিক ফযীলতের খাতিরে তিনি সারা রাত মুহূর্তের জন্যও
ঘুমাতে না। যেমন- হযরত আয়িশা (রাযি.) হতে বর্ণিত নিম্নে হাদীসে উক্ত
পবিত্র রাতের ফযীলতের দ্বারা সকলকে সৌভাগ্যশালী হওয়ার জন্য বলা
হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أُنْسِلَ النَّبِيُّ ﷺ
مِنْ مِرْطِيٍّ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا كَانَ مِرْطِيٍّ مِنْ حَرِيرٍ، وَلَا قَرٍّ، وَلَا كَتَانٍ، وَلَا
خَزٍّ، وَلَا صُوفٍ، قَالَ فَقُلْتُ لَهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: كَانَ
سَدَاؤُهُ مِنْ شَعْرِ وَكَانَتْ لُحْمَتُهُ مِنْ وَبَرٍ، وَأَحْسَبُ نَفْسِي أَنْ يَكُونَ ﷺ قَدْ
أَتَى بَعْضَ نِسَائِهِ، فَقُمْتُ، فَأَلْتَمِسُهُ فِي الْبَيْتِ، فَوَقَعَتْ يَدِي قَدَمِي عَلَى قَدَمِيهِ
وَهُوَ سَاجِدٌ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «سَجَدَ لَكَ سَوَادِي

^১ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৪৪৪, হাদীস: ১৩৮৯

وَحَيَّالِي، وَآمَنَ لَكَ فُؤَادِي، أَبُوءُ لَكَ بِالنَّعَمِ، وَأَعْتَرِفُ لَكَ بِالذَّنْبِ، ظَلَمْتُ
نَفْسِي، فَاعْفُرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ،
وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نِقَمَتِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ
لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»، قَالَتْ: فَمَا رَأَى ﷺ قَاتِلًا
وَقَاعِدًا حَتَّى أَصْبَحَ، وَقَدْ أَصْعَدَتْ قَدَمَاهُ، يَعْنِي انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، وَأَنَا
أَغْمَرُهَا، وَأَقُولُ: يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ؟ أَلَيْسَ قَدْ فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ أَلَيْسَ أَلَيْسَ؟ قَالَ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ! أَفَلَا
أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ هَلْ تَذَرِينَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: مَا فِيهَا؟
قَالَ: «فِيهَا يُكْتَبُ كُلُّ مَوْلُودٍ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَفِيهَا يُكْتَبُ كُلُّ مَيِّتٍ، وَفِيهَا
تَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ، وَفِيهَا تَرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا مِنْ
أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا
بِرَحْمَةِ اللَّهِ»، قُلْتُ: وَلَا أَنْتَ؟ قَالَ ﷺ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ
بِرَحْمَتِهِ»، فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى هَامَتِهِ وَعَلَى وَجْهِهِ.

‘হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাবান মাসের
মধ্যবর্তী রাতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার বিছানা হতে উঠলেন।
আল্লাহর শপথ, আমার বিছানা এমন কোনো রাজকীয় বিছানা ছিল না
বরং তা ছাগল ও উটের পশমের তৈরি ছিল। যখন তিনি আমার
বিছানা হতে উঠলেন, তখন আমার ধারণা হল তিনি হয়তো অন্য
কোনো উম্মুল মুমিনীনের ঘরে গমন করছেন। আমিও উঠে তাঁকে
খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাত তাঁর পদ মুবারকের ওপর
পড়ল। তিনি তখন সিজদারত অবস্থায় দুআ করছিলেন আমি সেই
দুআ মুখস্থ করলাম:

«سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَحَيَّالِي، وَآمَنَ لَكَ فُؤَادِي، أَبُوءُ لَكَ بِالنَّعَمِ، وَأَعْتَرِفُ
لَكَ بِالذَّنْبِ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاعْفُرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ
بِعَفْوِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نِقَمَتِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْكَ

سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى
نَفْسِكَ»

হযরত আয়িশা (রাযি.) আরও বলেন, রাসূল (সা.) ইবাদত-বন্দেগি করে রাত অতিবাহিত করে ফেললেন। দাঁড়িয়ে নামায আদায়কালে তাঁর পদদ্বয় ফুলে গিয়েছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন। আল্লাহ তাআলা কি আপনার পূর্বাপর গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেননি? হুযর (সা.) বললেন, ‘আমি কি আল্লাহ তাআলা কৃতজ্ঞ বান্দাদের মধ্যে পরিগণিত হবো না? আর এ রাত সম্পর্কে তুমি কি কিছু অবগত আছ?’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আজ রাতে কী? তিনি বললেন, ‘আজ রাতে জন্ম, মৃত্যু নির্ধারণ, জীবিকা বণ্টন এবং মানুষের কার্যাবলি আকাশে ওঠানো হয়ে থাকে।’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর রহমত ব্যতীত কেউই কি বেহেশতে যেতে পারবে না? তিনি উত্তরে বললেন, ‘না।’ আবার জিজ্ঞাসা করলাম আপনিও যেতে পারবেন না? তিনি উত্তর দিলেন, ‘না।’ আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আপনিও যেতে পারবেন না? তিনি বললেন, ‘না।’ অতঃপর তিনি তার হস্তদ্বয় মাথা এবং মুখ মাসেহ করলেন।^১

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ! أَيَّةَ لَيْلَةٍ هِيَ؟»
قَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: «لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فِيهَا تَرْفَعُ أَعْمَالُ
النَّاسِ، وَلِلَّهِ فِيهَا عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ بَعْدَ شَعْرِ غَنَمٍ كُلِّ، فَهَلِ أَنْتِ أَذْنَتِي لِـ
الْأَلَيْلَةِ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، فَصَلَّى، فَخَفَّفَ الْقِيَامَ وَقَرَأَ «الْحَمْدَ» وَسُورَةَ
خَفِيفَةً، ثُمَّ سَجَدَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَقَرَأَ فِيهَا نَحْوًا
مِنْ قِرَاءَةِ الْأَوَّلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ إِلَى الْفَجْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنْظَرُهُ حَتَّى
ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَبَضَ رُوحَ رَسُولِهِ ﷺ، فَلَمَّا طَالَ عَلَيَّ دَنُوتُ مِنْهُ حَتَّى
مَسِسْتُ أَحْصَصُ قَدَمِيهِ، فَتَحَرَّكَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ

^১ (ক) আল-জিলানী, আল-গুনয়াতু লি-তালিবায তরীকিল হক আযযা ওয়া জায্বা, খ. ১, পৃ. ৩৪৫; (খ) আল-বায়হাকী, আদ-দা'ওয়াতুল কবীর, খ. ২, পৃ. ১৪৫, হাদীস: ৫৩০

عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ وَجْهَكَ لَا
أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، « قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ
سَمِعْتُكَ تَذْكُرُنِي فِي سُجُودِكَ اللَّيْلَةَ شَيْئًا مَا سَمِعْتُكَ تَذْكُرُهُ قَطُّ، قَالَ ﷺ:
«وَعَلِمْتَ ذَلِكَ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ ﷺ: تَعَلَّمِيهِنَّ وَعَلِّمِيهِنَّ، فَإِنَّ جَبْرِئَلَ
ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أَذْكُرَهُنَّ فِي السُّجُودِ».

‘হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আয়িশা! তুমি জান আজ কোন রাত’? আমি বললাম, এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল অধিক জ্ঞাত। হযুর (সা.) ইরশাদ করেন, ‘আজ শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাত। এ রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে দোষখের শাস্তি হতে মুক্তি দান করেন। আজ কি তুমি আমাকে ইবাদতের অনুমতি দেবে’? হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, জি, হ্যাঁ। অতঃপর হযুর (সা.) সূরা আল-ফাতিহার পর ছোট একটি সূরা দিয়ে এক রাকআত নামায আদায় করে সিজদায় পতিত হয়ে অর্ধরাত অতিবাহিত করে দিলেন। দ্বিতীয় রাকআতও সংক্ষেপে আদায় করে বাকি অর্ধরাত সিজদায় কাটিয়ে দিলেন। তিনি সিজদায় এমনভাবে পড়ে রইলেন যে, আমার মনে হল আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র রূহ কবয করে নিয়েছেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। আমি উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের তলায় হাত দিলাম। তিনি একটু নড়ে-চড়ে উঠলেন। আমি তাঁকে সিজদারত অবস্থায় এ দুআ করতে শুনি,

«أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ،
جَلَّ وَجْهَكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি রাতে সিজদায় গমন করে যে দুআ পাঠ করেছেন আমি তা শুনেছি। কিন্তু এর পূর্বে আর কখনও তা শুনিনি। হযুর (সা.) ইরশাদ করলেন, ‘আমি যা বলেছি, তুমি শিখিয়ে রেখ এবং অন্যকে শিখিয়ে দাও। হযরত জিবরীল (আ.) আমাকে সিজদায় এ দুআ পাঠ করতে বলেছেন।’^১

^১ (ক) আল-জিলানী, *আল-গুনয়াতু লি-তালিযায় তরীকিল হক আযযা ওয়া জাওয়া*, খ. ১, পৃ. ৩৪৬; (খ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ইমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৬২-৩৬৩, হাদীস: ৩৫৫৬

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «جَاءَنِي جِبْرِيلُ ﷺ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ؟ قَالَ: هَذِهِ اللَّيْلَةُ يَفْتَحُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِيهَا ثَلَاثُمِائَةِ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الرَّحْمَةِ، يَغْفِرُ لَجَمِيعٍ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ مُدْمِنٌ خَمْرٍ أَوْ مُصْرًا عَلَى الرِّبَا وَالزَّنَا، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَغْفِرُ لَهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا ، فَلَمَّا كَانَ رُبْعُ اللَّيْلِ نَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا أَبْوَابُ الْجَنَّةِ مَفْتُوحَةٌ، وَعَلَى الْبَابِ الْأَوَّلِ مَلِكٌ يُنَادِي: طُوبَى لِمَنْ رَكَعَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَعَلَى الْبَابِ الثَّانِي مَلِكٌ يُنَادِي: طُوبَى لِمَنْ سَجَدَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَعَلَى الْبَابِ الثَّلَاثِ مَلِكٌ يُنَادِي: طُوبَى لِمَنْ دَعَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَعَلَى الْبَابِ الرَّابِعِ مَلِكٌ يُنَادِي: طُوبَى لِلذَّاكِرِينَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَعَلَى الْبَابِ الْخَامِسِ مَلِكٌ يُنَادِي: طُوبَى لِمَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَعَلَى الْبَابِ السَّادِسِ مَلِكٌ يُنَادِي: طُوبَى لِلْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَعَلَى الْبَابِ السَّابِعِ مَلِكٌ يُنَادِي: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤْلُهُ؟ وَعَلَى الْبَابِ الثَّامِنِ مَلِكٌ يُنَادِي: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيَغْفَرَ لَهُ؟ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! إِلَى مَتَى تَكُونُ هَذِهِ الْأَبْوَابُ مَفْتُوحَةً؟ قَالَ: إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ».

‘হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘শাবানে মর্ঘবর্তী রাতে হযরত জিবরীল (আ.) আমার নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা আকাশের দিকে ওঠান। কেননা আজ বরকতের রাত! আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেমন বরকত? হযরত জিবরীল (আ.) বললেন, এ রাতে আল্লাহ তাআলা রহমতের ৩০০টি দ্বার খুলে দেন। মুশরিক, যাদুকর, গণক, সর্বদা মদ্য পানকারী, ব্যভিচারী ও সুদখোর ব্যতীত সকলকেই আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন। রাতের চতুর্থাংশ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আবার হযরত জিবরীল (আ.) এসে বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.)!

মাথা উত্তোলন করুন। আমি আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে দেখলাম, বেহেশতের সব দরজা উন্মুক্ত। প্রথম দরজায় একজন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে বলছেন, আজ রাতে যে রুকু করেন তাঁর জন্য সুসংবাদ। দ্বিতীয় দরজায় একজন দাঁড়িয়ে বলছেন, আজ রাতে যে সিজদা করেন তাঁর জন্য সুসংবাদ। তৃতীয় দরজায় একজন বলছেন, আজ রাতে যিকরকারীর জন্য সৌভাগ্য। চতুর্থ দরজায় একজন দাঁড়িয়ে বলছেন, আজ রাতে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর জন্য সুসংবাদ। পঞ্চম দরজায় একজন দাঁড়িয়ে বলছেন, কোনো প্রার্থনাকারী থাকলে প্রার্থনা কর আজ প্রার্থনা পূরণ করা হবে। ষষ্ঠ দরজায় একজন দাঁড়িয়ে বলছেন, কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী থাকলে করতে পার আল্লাহ তাআলা আজ রাতে তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি হযরত জিবরীল (আ.)-কে জিজ্ঞাস করলাম, কখন পর্যন্ত এসব দরজা উন্মুক্ত থাকবে? হযরত জিবরীল (আ.) বললেন, সুবহি সাদিক পর্যন্ত।”^১

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

‘তোমরা শবে বরাতকে সম্মান কর, তা শাবান মাসের ১৪ তারিখের দিবাগত রাত। এ রাতে যারা ইবাদতে নিমগ্ন থাকে তাদের প্রতি আল্লাহর রহমতের ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন এবং তাঁদের সগীরা-কবীরা গোনাহসমূহ আল্লাহ মোচন করে দেন।’

আর এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমায়েছেন যে, ‘ফেরেশতা হযরত জিবরীল (আ.) এসে আমাকে বলে গেলেন, আপনার উম্মতগণকে জানিয়ে দিন যে, তারা যদি শবে বরাতকে জীবিত রাখে তবে শবে কদরকে জীবিত রাখল।’

একথার অর্থ হচ্ছে শবে বরাতের ইবাদতের ফযীলত শবে কদরের ইবাদতের ফযীলতেরই সমতুল্য।

عَنِ ابْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ النَّصْرِ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ».

‘হযরত মুহাম্মদ ইবনে কুরদূস (রহ.) তাঁর পিতা হযরত কুরদূস ইবনুল আব্বাস (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে করীম (সা.) ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি এ রাতকে জীবিত রাখে অর্থাৎ ইবাদত-

^১ আল-জিলানী, আল-গুনয়াতু লি-তালিবায তরীকিল হক আযযা ওয়া জাল্লা, খ. ১, পৃ. ৩৪৭

বন্দেগি দ্বারা ভোর করে দেয় আল্লাহ পাক তাকেও জীবিত রাখবেন অর্থাৎ তার আমলনামায় মৃত্যুর পরেও কিয়ামত পর্যন্ত সওয়াব লিখা হতে থাকবে।’^১

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল করীম (সা.) বলেন, ‘হযরত জিবরীল (আ.) এসে আমাকে বলে গেলেন যে, হে আল্লাহর নবী (সা.)! আপনি উঠে নামায পড়ুন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন। কারণ এ রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের জন্য ১০০ রহমতের দরওয়াজা খুলে রাখেন। অতএব এ রাতে আপনি আপনার উম্মতগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অবশ্য মুশরিক, যাদুকর, গণক, বখীল, সুদখোর, শরাবখোর ও যিনাখোরদের জন্য ক্ষমা চাইবেন না। কারণ তাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন।’

অতএব উক্ত রাতের এত অত্যাধিক ফযীলত ও বরকত যে, হযরত ঈসা (আ.) এ রাতের ফযীলত ও বরকত সম্পর্কে জানতে পেয়ে একজন সম্মানিত পয়গাম্বর হয়েও তিনি আপসোস করে বলেছেন, ‘আমি নবী না হয়ে যদি শেখনবীর উম্মত হতাম।’

এতে প্রতীয়মান হয় যে, লায়লাতুল বরাত প্রিয় নবীজি (সা.)-এর উম্মতের জন্য কত বড় মর্যাদা। হযরত হাসান আল-বাসারী (রহ.) হুযুর (সা.)-এর ৩০জন সাহাবীর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ রাতে নামায আদায়কারীর প্রতি আল্লাহ তাআলা ৭০ বার (রহমতের) দৃষ্টিপাত করে থাকেন এবং প্রত্যেক দৃষ্টিতে ৭০টি করে মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করে থাকেন। সবচেয়ে কম মর্যাদা ক্ষমা লাভ করা।

বর্ণিত আছে, লায়লাতুল বরাতের এতোই ফযীলত যে, ‘যারা উক্ত রাতে ১০০ হতে ৩০০বার হুযুর (সা.)-এর ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর দোযখ হারাম করে দেবেন এবং হুযুর (সা.) তাদেরকে সুপারিশ করে বেহেশতে নিয়ে যাবেন।’

বর্ণিত আছে,

«مَنْ صَامَ يَوْمَ الْخَامِسِ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ أَبَدًا».

^১ ইবনুল আ'রাবী, মু'জামুশ শুযুখ, খ. ৩, পৃ. ১০৪৭, হাদীস: ২২৫২

‘যে ব্যক্তি শাবান মাসের ১৫ তারিখ রোযা রাখবে দোযখের আগুন কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।’

লায়লাতুল বরাতে মানুষের রিয়ক বণ্টন হয়

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

‘শাবানের চাঁদের ১৫ রাতে (অর্থাৎ ১৪ দিবাগত রাতে) আগামী এক বছরের হায়াত, মওত, রিয়ক ও দৌলত নির্ধারিত করা হয় এবং ওই রাতে বান্দাগণের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়।’

রিয়ক সম্পর্কে হুযুর (সা.) বলেছেন,

‘উক্ত লায়লাতুল বরাতে আল্লাহ পাক সূর্যাস্ত হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত দুনিয়ার আকাশে এসে দুনিয়াবাসীর জন্য ঘোষণা করতে থাকেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা গোনাহ মাফ করিয়ে নিতে চাও, মাফ চেয়ে নাও। আমি মাফ করার জন্য প্রস্তুত আছি। তোমাদের মধ্যে যার রিয়কের দরকার থাকে, রিয়ক চেয়ে নাও আমি রিয়ক দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।’^১

উপরে বর্ণিত গোনাহ মার্ফের কথা যা বর্ণনা করা হয়েছে তা গোনাহ সগীরা। গোনাহ কবীরা তওবা করলে মাফ হবে। এর সাথে স্মরণ রাখবে, অন্যের (বান্দার) হকহরণ করলে যেসব গোনাহ হয় যতক্ষণ না সে মাফ করে না তা মাফ হবে না।

এ রাতে শুধু যে নফল নামাযই পড়বে এমন কোনো কথা নেই। নফল নামাযের সাথে অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি যথা— তিলাওয়াতে কুরআন, দুআ-দরুদ, তাসবীহ-তাহলীল, যিক্র-আযকার প্রভৃতি কাজগুলো করলেও অশেষ সওয়াব হাসিল হয়। মোটকথা যেকোনো রূপ ইবাদতের ভেতরে এ রাতটি ভোর করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ্রামে বা শহরে এ রাতে মিষ্টান্ন বা অন্য কোনোরূপ সুখাদ্যের বন্দোবস্ত করা হয়। এটি দোষণীয় নয়। তবে তা বাধ্যবাধকতার সাথে পালন করলে বিদআতের মধ্যে গণ্য হবে।

^১ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৪৪৪, হাদীস: ১৩৮৮

পবিত্র শবে বরাত ও শবে কদর উপলক্ষে উপদেশাবলি

এ মুবারক রাতে আল্লাহ তাআলার প্রেমিকগণ এবং আউলিয়ায়ে কেরাম নিম্নোক্ত কয়েকটি দুআ বিশেষভাবে পড়ে থাকেন। সমস্ত মুমিন বান্দার অবগতির জন্য তা প্রকাশ করা হল:

১. سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্দিহী সুবহা-নাল্লা-হিল্ ‘আযীম),
২. «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا» (আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা ‘আফু‘উন্ তুহিব্বুল্ ‘আফুওয়া ফা‘ফু ‘আল্লা),
৩. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (ইয়া আরহামার রাহেমীন),
৪. رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (রব্বানা--- আতিনা ফিদ্ দুন্‌য়া হাসানাতওঁ ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি হাসানাতওঁ ওয়া কিনা- ‘আযাবান্ নারি)।

উপর্যুক্ত দুআসমূহ সূর্যাস্তের পর হতে ফজরের নামাযের পূর্বপর্যন্ত সময় ও সুযোগ অনুযায়ী যত বেশি পাঠ করা যায় ততই সওয়াবের ভাগী হবে। তাহাজ্জুদের নামাযে যাহিরী ও বাতিনী নিয়ামতের জন্য একটি মকবুল উসীলা, এতে কলব রওশন থাকে ও কবরে রৌশনি পাওয়া যায়।

এ রাতে দান-খয়রাত ও সাদকা করলে আল্লাহ তাআলার গযব হতে রক্ষা পাওয়া যায়। সর্বদা আল্লাহ তাআলার যিক্র করলে তাঁর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করা যায়। উক্ত রাতে নফল নামায, ইস্তিগফার, কুরআন পাঠ ও তাহাজ্জুদ নামাযের পর দীন-দুনিয়ার শান্তির জন্য এবং নিজ নিজ মকসুদের জন্য দুআ করলে কবুল হয়। প্রত্যেক রাতের শেষাংশে এবং বিশেষ করে উক্ত পবিত্র রাতসমূহে আরশে মুআল্লাহ হতে রহমতের ফয়েয ও তাজাল্লিয়াতে বারী তাআলার ফয়েয বিশেষভাবে নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলার প্রেমিকগণ রাতের শেষাংশে অর্থাৎ ৩টা হতে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলার যিক্র করত অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে তাঁর দরবারের দিকে

নিজ নিজ কলব বা অন্তরঙ্গে ঝুকিয়ে রাখতেন। এ সময়টা বিশেষত এ রাতদ্বয়ের জন্য মূল্যবান।

ইবাদতের নিয়মাবলি

ফুরফুরা শরীফের হযরত শাহ মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক (রহ.)-এর আমল অনুযায়ী উক্ত পবিত্র রাতদ্বয়ের নামায, ইস্তিগফার, যিক্র ও দরুদ শরীফের নিয়ম হচ্ছে যে,

১. মনকে পরিষ্কার করে কলেমার তাইয়িবা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (লা--- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ) ২৫ বার এবং أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ (আস্তাগ্ফিরুল্লা-হা রাব্বী মিন্ কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতুব্ব ইলাইহি) ২৫ বার এবং দরুদ শরীফ ২৫ বার পড়বেন।
২. এরপর নফল নিয়তে ১২ রাকআত নামায পড়া দরকার। প্রথম রাকআতে সূরা আল-কদর (اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) ১ বার, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-ইখলাস (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ৩বার পড়ে নামায আদায় করবেন অথবা অন্য যেকোনো সূরাও পড়া যাবে। এভাবে ১২ রাকআত নামায আদায় করবেন এবং প্রতি ৪ রাকআতের পর মুনাজাত করবেন।
৩. অতঃপর দরুদ শরীফ ১০০ বার, ইস্তিগফার (সম্পূর্ণ) ১০০ বার, اللَّهُمَّ اِنَّا اِلَيْكَ رَاغِبُونَ (আল্লা-হুছ হামাদ) ৫০০ বার, পুনরায় দরুদ শরীফ ২৫ বার পড়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে অতিশয় বিনয় ও নম্রতার সাথে মুনাজাত করবেন। ঈমান ও ইজ্জত রক্ষার জন্য, দুষমন হতে বাঁচার জন্য, দীন-দুনিয়ার উন্নতি ও শান্তির জন্য, পীর-মুরশিদ, পিতা-মাতা, গুরুজন, স্ত্রী-পরিজন ও নিজ নিজ যাবতীয় মকসুদের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করে মুনাজাত শেষ করবেন।
৪. এ রাতে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার বা কবর যিয়ারত করলে দু'জাহানের বিশেষ ফায়দা লাভ হয়।

নির্দেশনায়

হাদীসে যামান শাহ সুফি

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)

পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ، لِنُرِيَهُ، مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ﴾

‘সেই যাত পাক যিনি স্বীয় বান্দাকে রজনীর কোনো অংশে
মসজিদ হারাম (কা’বা) হতে মসজিদ আকসা (বায়তুল
মাকদিস) পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, যার চতুর্দিশে আমি
বরকতময় করেছি এ জন্য যে, আমি তাকে আমার
নিদর্শনসমূহ পরিদর্শন করাব। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও
সর্বদর্শী।’

সূরা আল-ইসরা

পবিত্র শবে মি'রাজ

আরবি মাসের সপ্তম মাস রজব। এ মাসের ২৭ তারিখ রাতকে শবে মি'রাজ বলা হয়। এ রাতের এক বিরাট ইতিহাস রয়েছে। তা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা দেওয়া হল:

মি'রাজ আরবি শব্দ, অর্থ: উর্ধ্বগমন। شب (শব) ফারসি শব্দ, অর্থ: রজনী। শবে মি'রাজ অর্থ: উর্ধ্বগমনের রজনী। যে রাতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) মি'রাজ শরীফ গমন করেছিলেন সেই রাতকে শবে মি'রাজ বলা হয়। অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টা আল্লাহ তাআলা তাঁর শ্রেষ্ঠতম নবী ও রাসূল (সা.) দ্বারা যে মহা-অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেছিলেন সে বিখ্যাত ঘটনার রাতই পৃথিবীর সর্বত্র শবে মি'রাজ নামে পরিচিত। মি'রাজ সম্পর্কে কুরআন পাকের মধ্যে সূরা আল-ইসরায় আল্লাহ পাক বলেছেন,

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ
لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٥

‘সেই যাত পাক যিনি স্বীয় বান্দাকে রজনীর কোনো অংশে মসজিদ হারাম (কাবা) হতে মসজিদ আকসা (বায়তুল মাকদিস) পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, যার চতুষ্পার্শ্বে আমি বরকতময় করেছি এ জন্য যে, আমি তাকে আমার নিদর্শনসমূহ পরিদর্শন করাবো। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদর্শী।’^১

اَسْرَى (আসরা) শব্দটি اِسْرَاءُ ধাতু হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ: রাতে নিয়ে যাওয়া। এরপর اَسْرَى শব্দটি স্পষ্টত এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:১

৩৯ পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ

لَيْلٍ (লায়লান) শব্দটি نَكْرَةٌ (অনির্দিষ্ট) ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত নয়, বরং রাতের একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে ইসরা বলা হয় এবং সেখান হতে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে তার নাম মি'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মি'রাজ সূরা আন-নাজমে উল্লিখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে رُبِّيَّةٌ (বি'আব্দীহী) শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কাউকে আমার বান্দা বললে এর চেয়ে বড় সম্মান মানুষের জন্যে আর হতে পারে না।^১

দৈহিক মি'রাজের প্রমাণাদি

ইসরা ও মি'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মতো দৈহিক ছিল একথা কুরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سُبْحَانَ (সুবহানা) শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। মি'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হত তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

عَبْدٌ ('আব্দ) শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ শুধু আত্মাকে আবদ বলে না, বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মি'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রাযি.)-এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না। প্রকাশ করলে কাফিররা আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হত তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মি'রাজের ঘটনা প্রকাশ করলেন তখন কাফিররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। এমনকি কতিপয়

^১ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাজারিফুল কুরআন*, পৃ. ৭৬৩-৭৬৪

নওমুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটান সম্ভাবনা ছিল কি? তবে এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোনো আত্মিক মি'রাজ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থী নয়।

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ ۖ -এ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মতে ۖ (স্বপ্ন) বলে ۖ (দেখা) বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এক ۖ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এ হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে ۖ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দৃষ্টান্ত এমন যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি ۖ শব্দের অর্থাৎ স্বপ্নই নেওয়া হয় তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ মি'রাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এবং হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে যে স্বপ্নযোগে মি'রাজ হওয়া কথা বর্ণিত হয়েছে তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মি'রাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। ইমাম আবু বকর আন-নাক্কাস (রহ.) এ সম্পর্কে ২০ জন সাহাবীর রিওয়ায়ত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাযী আয়ায (রহ.) তাঁর শিফাগ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।^১

হাফিয ইবনে কসীর (রাযি.) স্বীয় তফসীরগ্রন্থে এসব রিওয়ায়ত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ২৫ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের কাছ হতে এসব রিওয়ায়ত বর্ণিত রয়েছে। নামগুলো হচ্ছে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.), হযরত আলী মরতুযা (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.), হযরত মালিক ইবনে সা'সা'আ (রাযি.), হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.), হযরত আবু সাযীদ আল-খুদরী (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাযি.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.), হযরত আবদুর রহমান ইবনে কুরয (রাযি.), হযরত আবু হাব্বা আল-আনসারী (রাযি.), হযরত আবু লায়লা আল-আনসারী (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.), হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.), হযরত বুরায়দা ইবনুল হুসাইব (রাযি.), হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাযি.), হযরত আবু উমামা

^১ আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, খ. ১০, পৃ. ২০৫ ও ২০৯

(রাযি.), হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযি.), হযরত আবুল হামরা (রাযি.), হযরত সুহায়ব আর-রুমী (রাযি.), হযরত উম্মে হানী (রাযি.), হযরত আযিশা (রাযি.) ও হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযি.)।^১

এরপর ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন,

فَحَدِيثُ الْإِسْرَاءِ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَاعْتَرَضَ فِيهِ الزَّنَادِقَةُ
الْمُلْحِدُونَ.

‘এ সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐক্যমত রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা এটি মানেনি।’^২

হাফিয ইবনে কসীর (রহ.) স্বীয় তফসীরত্বে আলোচ্য আয়াতের তফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন, সত্য কথা হচ্ছে,

وَالْحَقُّ أَنَّهُ ﷺ أُسْرِيَ بِهِ يَقْظَةً لَا مَنَامًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَاكِبًا
الْبُرَاقَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، رَبَطَ الدَّابَّةَ عِنْدَ الْبَابِ وَدَخَلَهُ، فَصَلَّى
فِي فَيْلَتِهِ تَحْتَ الْمَسْجِدِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى الْمِعْرَاجَ وَهُوَ كَالسُّلَمِ ذُو دَرَجٍ
يُرْقَى فِيهَا، فَصَعِدَ فِيهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ إِلَى بَقِيَّةِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، فَتَلَقَّاهُ
مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُونَهَا، وَسَلَّمُوا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ فِي السَّمَاوَاتِ بِحَسَبِ
مَنَازِلِهِمْ وَدَرَجَاتِهِمْ، حَتَّى مَرَّ بِمُوسَى الْكَلِيمِ فِي السَّادِسَةِ، وَإِبْرَاهِيمَ
الْخَلِيلِ فِي السَّابِعَةِ، ثُمَّ جَاوَزَ مَنَزِلَتَهُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمَا وَعَلَى
سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُسْتَوَى يَسْمَعُ فِيهِ صَرِيْفُ الْأَقْلَامِ، أَيْ أَقْلَامَ
الْقَدْرِ بِمَا هُوَ كَاتِنٌ، وَرَأَى سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَظَمَةٌ
عَظِيمَةٌ، مِنْ فَرَاشٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَلْوَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَغَشِيَهَا الْمَلَائِكَةُ، وَرَأَى
هُنَالِكَ جِبْرِيلَ عَلَى صُورَتِهِ، وَلَهُ سِتْمِائَةُ جَنَاحٍ، وَرَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ
الْأَفْقَ، وَرَأَى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ، وَإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ بَانِي الْكَعْبَةِ الْأَرْضِيَّةِ

^১ ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ৫, পৃ. ৪২

^২ ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ৫, পৃ. ৪২

مُسْنِدًا ظَهَرَهُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْكَعْبَةُ السَّائِيَّةُ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَتَعَبَّدُونَ فِيهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَرَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُنَالِكَ الصَّلَوَاتِ خَمْسِينَ، ثُمَّ خَفَّفَهَا إِلَى خَمْسٍ؛ رَحْمَةً مِنْهُ وَلُطْفًا بِعِبَادِهِ، وَفِي هَذَا اعْتِنَاءٌ عَظِيمٌ بِشَرَفِ الصَّلَاةِ وَعَظَمَتِهَا.

ثُمَّ هَبَطَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَهَبَطَ مَعَهُ الْأَنْبِيَاءُ فَصَلَّى بِهِمْ فِيهِ لَمَّا حَانَتِ الصَّلَاةُ، وَتُحْتَمَلُ أَنَّهَا الصُّبْحُ مِنْ يَوْمِئِذٍ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي السَّمَاءِ، وَالَّذِي تَظَاهَرَتْ بِهِ الرَّوَايَاتُ أَنَّهُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَلَكِنْ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ دُخُولِهِ إِلَيْهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمَّا مَرَّ بِهِمْ فِي مَنْازِلِهِمْ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ جِبْرِيلَ وَاحِدًا وَاحِدًا، وَهُوَ يُخْبِرُهُمْ بِهِمْ، وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا مَطْلُوبًا إِلَى الْجَنَابِ الْعُلَوِيِّ لِيَفْرِضَ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ مَا يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ لَمَّا فَرَعَ مِنَ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ، اجْتَمَعَ هُوَ وَإِخْوَانُهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، ثُمَّ أَظْهَرَ شَرَفَهُ وَفَضْلَهُ عَلَيْهِمْ بِتَقْدِيمِهِ فِي الْإِمَامَةِ، وَذَلِكَ عَنْ إِشَارَةِ جِبْرِيلَ ﷺ لَهُ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَرَكِبَ الْبُرَاقَ، وَعَادَ إِلَى مَكَّةَ بِغَلَسٍ.

‘নবী করীম (সা.) ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেছেন, স্বপ্নে নয়। মক্কা মুকাররামা হতে বায়তুল মাকদিসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বুৰাকটি অদূরে বাঁধেন এবং বায়তুল মাকদিসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কিবলার দিকে মুখ করে দু’রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করলেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নীচ হতে উপরে যাওয়ার জন্যে ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশ, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করলেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কি ধরনের ছিল তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তাআলাই জানেন। ইদানিংকালেও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও আছে। এ অলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক

আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং প্রত্যেক আকাশে সে সকল পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে যাদের অবস্থান কোনো নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণত ষষ্ঠ আকাশে হযরত মুসা (আ.) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। অতঃপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে এক ময়দানে পৌঁছেন যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি সিদরাতুল মুনতাহা দেখেন যেখানে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙের প্রজাপতি ইতস্তত ছোট্টাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত জিবরীল (আ.)-কে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ৬০০ পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের 'রফরফ' দেখতে পান। সবুজ রঙের পদিবিশিষ্ট পাক্কীকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল মা'মুরও দেখেন। বায়তুল মা'মুরের নিকেটই কাবার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এ বায়তুল মা'মুরে দৈনিক ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পূর্ববার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বচক্ষে জান্নাত ও দোযখ পরিদর্শন করলেন। সে সময় তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে ৫০ ওয়াক্তের নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তাহাস করে ৫ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এর দ্বারা সব ইবাদতের মধ্যে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতঃপর তিনি বায়তুল মাকদিসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আকাশে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল মাকদিসে অবতরণ করলেন। তাঁরা (যেন) তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানানোর জন্য বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত আগমন করলেন। তখন নামাযের সময় হয়ে যায় এবং পয়গাম্বরগণের সাথে নামায আদায় করলেন। সেটা সেদিনকার ফজরের নামাযও হতে পারে।

হাফিয ইবনে কসীর (রহ.) বলেন, নামাযে পয়গাম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যত এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা আকাশে পয়গাম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিবরীল (আ.) সব পয়গম্বরগণের সাথে

তাকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে এখানে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এছাড়াও সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল উর্ধ্বজগতে গমন করা। কাজেই এ কাজটি প্রথমে সেরে নেওয়াই অধিকতর যুক্তিসংঘত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায়দানের জন্য তাঁর সাথে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত আসেন এবং হযরত জিবরীল (আ.)-এর ইঙ্গিতে তাঁকে সবাই ইমাম বানিয়ে কার্যত তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়।

এরপর তিনি বায়তুল মাকদিস হতে বিদায় নেন এবং বুরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কা মুকাররমা পৌঁছে যান।^১

মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য

তাফসীরে ইবনে কসীরে বলা হয়েছে, হাফিয আবু নুআইম আল-আসবাহানী (রহ.) তাঁর দালায়িলুন নুবুওয়াতগ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ওমর আল-ওয়াকিদীর সনদে বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ إِلَى قَيْصَرَ، فَذَكَرَ وَرُودَهُ عَلَيْهِ وَقُدُومَهُ إِلَيْهِ، وَفِي السِّيَاقِ دَلَالَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى وَفُورِ عَقْلِ هِرْقُلَ، ثُمَّ اسْتَدْعَى مِنْ بِالشَّامِ مِنَ التُّجَّارِ، فَجِئَءَ بِأَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ وَأَصْحَابِهِ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ تِلْكَ الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَجَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ يَجْهَدُ أَنْ يُحَقِّرَ أَمْرَهُ وَيُصَغِّرَهُ عِنْدَهُ، قَالَ فِي هَذَا السِّيَاقِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ قَوْلًا أَسْقِطُهُ مِنْ عَيْنِهِ إِلَّا أَنِّي أَكْزَرُهُ أَنْ أَكْذِبَ عِنْدَهُ كَذْبَةً يَأْخُذُهَا عَلَيَّ، وَلَا يُصَدِّقُنِي بِشَيْءٍ، قَالَ: حَتَّى ذَكَرْتُ قَوْلَهُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ! أَلَا أَخْبِرُكَ خَبْرًا تَعْرِفُ أَنَّهُ قَدْ كَذَبَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: قُلْتُ:

^১ (ক) মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ৭৬৪-৭৬৫; (খ) ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ৫, পৃ. ৪০

إِنَّهُ يَزْعُمُ لَنَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ أَرْضِنَا أَرْضِ الْحَرَمِ فِي لَيْلَةٍ، فَجَاءَ مَسْجِدَكُمْ هَذَا
مَسْجِدَ إِبِلِيَاءَ، وَرَجَعَ إِلَيْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَبْلَ الصُّبْحِ، قَالَ: وَبَطْرِيقُ إِبِلِيَاءَ عِنْدَ
رَأْسِ قَيْصَرٍ، فَقَالَ: بَطْرِيقُ إِبِلِيَاءَ: قَدْ عَلِمْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَنَظَرَ قَيْصَرٌ،
وَقَالَ: وَمَا عَلِمُكَ بِهَذَا؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ لَا أَنَامُ لَيْلَةً حَتَّى أُغْلِقَ أَبْوَابَ
الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَغْلَقْتُ الْأَبْوَابَ كُلَّهَا غَيْرَ بَابٍ وَاحِدٍ
غَلْبَنِي، فَاسْتَعَنْتُ عَلَيْهِ بِعَمَلِي وَمَنْ يُخْضِرُنِي كُلَّهُمْ فَعَالَجْتُهُ فَعَلْبَنِي، فَلَمْ
نَسْتَطِعْ أَنْ نُحَرِّكُهُ، كَاتَمًا نَزَاوِلَ بِهِ جَبَلًا، فَدَعَوْتُ إِلَيْهِ النَّجَاجِرَةَ، فَنَظَرُوا
إِلَيْهِ، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الْبَابَ سَقَطَ عَلَيْهِ النَّجَافُ وَالْبُتْيَانُ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ
نُحَرِّكَهُ حَتَّى نُصْبِحَ فَنَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ أَتَى، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَتَرَكْتُ الْبَائِنِينَ
مَفْتُوحِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَيْهِمَا فَإِذَا الْحَجَرُ الَّذِي فِي زَاوِيَةِ الْبَابِ
مَنْقُوبٌ، وَإِذَا فِيهِ أَثَرُ مَرْبِطِ الدَّابَّةِ قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: مَا حِسَسَ هَذَا
الْبَابُ اللَّيْلَةَ إِلَّا عَلَى نَبِيٍّ، وَقَدْ صَلَّى اللَّيْلَةَ فِي مَسْجِدِنَا.

‘মুহাম্মদ ইবনে কা’ব আল-কুরায়ী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.)
রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দিহইয়া ইবনে
খলীফাকে প্রেরণ করলেন। এরপর হযরত দিহইয়া (রহ.)-এর পত্র
পৌছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও
বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা
সহীহ আল-বুখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান
রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহার বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট
হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবস্থা জানার
জন্যে আরবের কিছুসংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে
চাইলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ও তার সঙ্গীরা সে সময়
বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সে দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী
তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হল। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব
প্রশ্ন করেছিলেন সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ আল-বুখারী ও
মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবু সুফিয়ানের আন্তরিক

বাসনা ছিল যে, সে এ সুযোগে রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিজেই বলল যে, আমার এ ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার পথে একটি মাত্র অন্তরায় ছিল। তা হচ্ছে আমার মুখ দিয়ে কোনো সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয়প্রতিপন্ন হবো এবং আমার সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভর্ৎসনা করবে। তখন আমার মনে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নেবেন। আমি বললাম, আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কী? আবু সুফিয়ান বলল, নুবুওয়তের এ দাবিদারের বক্তব্য হচ্ছে, তিনি এক রাতে মক্কা মুকাররমা হতে বের হয়ে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত পৌঁছেছেন এবং প্রত্যুষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে এসেছেন।

ইলিয়ার (বায়তুল মাকদিসের) সর্বপ্রধান যাজক ও পণ্ডিত তখন রোম সম্রাটের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, আমি সে রাত সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তাঁর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? তিনি বললেন, আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মাকদিসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাতে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হল না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হল না। (দরজার কপাট স্বস্থান হতে মোটেই নড়ছিল না।) মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোনো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপরাগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল, কপাটের ওপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে,

মসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তরখণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোনো জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম, আল্লাহ তাআলা এ দরজাটি সম্ভবত এ কারণে বন্ধ হতে দেননি যে, হয়তোবা আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করলেন যে, সে রাতে তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আরও বিশদ বর্ণনা দিলেন।^১

ইসরা ও মি'রাজের তারিখ

ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী (রহ.) স্বীয় তফসীরগ্রন্থে বলেছেন, মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়ত বর্ণিত রয়েছে। হযরত মুসা ইবনে ওকবা (রহ.)-এর রিওয়ায়ত হচ্ছে, ঘটনাটি হিজরতের ৬ মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, হযরত খদীজা (রাযি.)-এর ওফাত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.) বলেন, হযরত খদীজা (রাযি.)-এর ওফাত নুবুওয়তপ্রাপ্তির ৭ বছর পরে হয়েছিল।

কোন কোন রিওয়ায়ত রয়েছে, মি'রাজের ঘটনা নুবুওয়তপ্রাপ্তির ৫ বছর পরে ঘটেছে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, মি'রাজের ঘটনা নুবুওয়তপ্রাপ্তির ৫ বছর পরে ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।^২ এসব রিওয়ায়তের সারমর্ম হচ্ছে, মি'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

হযরত ইবরাহীম আল-হরবী (রহ.) বলেন, ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা রবীউস সানী মাসের ২৭ তম রাতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইমাম ইবনুল কাসিম আয-যাহাবী (রহ.) বলেন, নুবুওয়তপ্রাপ্তির ১৮ মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রিওয়ায়ত উল্লেখ করার পরে কোনো সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু সাধারণভাবে খ্যাত হচ্ছে, রজব মাসের ২৭তম রাত মি'রাজের রাত।^৩

^১ (ক) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ৭৬৫; (খ) ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৫, পৃ. ৪১-৪২

^২ ইবনে ইসহাক, *আস-সিয়ার ওয়াল মাগাযী*, পৃ. ২৯৫

^৩ (ক) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ৭৬৫; (খ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১০, পৃ. ২১০

মসজিদ হারাম ও মসজিদ আকসা

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟
قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى»، قُلْتُ:
كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَأَيُّنَا أَدْرَكَكَ الصَّلَاةُ، فَصَلَّ، فَهُوَ
مَسْجِدٌ».

হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোটি? তিনি বললেন, ‘মসজিদে হারাম।’ অতঃপর আমি আরয করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, ‘মসজিদে আকসা।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ উভয়ের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন, ‘৪০ বছর।’ তিনি আরও বললেন, ‘এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়ে নাও।’^১

তফসীরবিদ মুজাহিদ (রহ.) বলেন, আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ হতে দু’হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিস্তর সপ্তম জমিনের অভ্যন্তরে পর্যন্ত পৌঁছেছে।^২

বায়তুল্লাহর চারপাশে মসজিদকে মসজিদে হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হারামকেও মসজিদে হারাম বলে দেওয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দুটি রিওয়াযতের এ বৈপরিত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রিওয়াযতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উম্মে হানী (রাযি.)-এর ঘর হতে ইসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেওয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে হযরত উম্মে হানী (রাযি.)-এর ঘরে ছিলেন। অতঃপর সেখান হতে কাবা শরীফের হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান হতে সফরের সূচনা হয়।^৩

^১ (ক) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ৭৬৫; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩৭০, হাদীস: ১ (৫২০)

^২ (ক) মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ৭৬৫-৭৬৬; (খ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ১৩৭

^৩ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, পৃ. ৭৬৬

বায়তুল্লাহ শরীফ হতে বায়তুল মাকদিস নিয়ে যাওয়াকে ইসরা এবং বায়তুল মাকদিস হতে আসমান ও এর উর্ধ্ব নিয়ে যাওয়াকে মি'রাজ বলা হয়। অবশ্য অধুনা মি'রাজ বলতে উভয়কে বোঝায়।

মি'রাজ কোন চাঁদে কোন তারিখে হয়েছিল এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিকাংশের মতে হুযুর (সা.)-এর মক্কায় অবস্থানকালে হিজরতের ১৭ বা ১৮ মাস পূর্বে নুবুওয়ত পাওয়ার পর একাদশ বা দ্বাদশ সনে তাঁর প্রায় ৫২ বছর বয়ঃক্রমকালে রজব মাসের ২৭ তারিখ রাতে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।

শবে মি'রাজের বিবরণ

২৭ রজবের রাতে অর্থাৎ ২৬ রজব দিবাগত রাতে রাসূল পাক (সা.) ইশার নামাযের পর হযরত উম্মে হানী (রাযি.)-এর ঘরে শায়িত ছিলেন। হঠাৎ ঘরের ছাদ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর হযরত জিবরীল (আ.) অবতরণ করে হুযুর (সা.)-কে কাবা শরীফের আঙিনায় হাতীম নামক স্থানে নিয়ে গেলেন। সেখান হতে হুযুর (সা.)-কে যমযম কূপের নিকট নিয়ে গেলেন। সেখানে শক্কে সদর অর্থাৎ বক্ষবিদীর্ণ করার পর জিন ও লাগাম সজ্জিত বুরাক নামের শ্বেতবর্ণের একটি জন্তুর পিঠে হযরত জিবরীল (আ.) নবীজি (সা.)-কে আরোহণ করালেন। হযরত জিবরীল (আ.) রিকাব কসে ধরলেন এবং হযরত মীকায়ীল (আ.) ধরলেন লাগাম। এটি আল্লাহ তরফ হতে প্রেরিত একটি স্বর্গীয় প্রাণী। এর চলন্তগতি বিদুতের ন্যায় এত দ্রুতগামী ছিল যে, একেক কদমে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে যেত।

হযরত জিবরীল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বুরাকে নিয়ে ইয়াসসির (মদীনা শরীফের পূর্বনাম), মাদায়িন ও বায়তুল লাহাম ইত্যাদি স্থান হয়ে বায়তুল মাকদিস পৌঁছেন। পথিমধ্যে হুযুর (সা.) আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বহু অলৌকিক ঘটনা ও দৃশ্যাবলি স্বচক্ষে অবলোকন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বায়তুল মাকদিস উপস্থিত হয়ে পূর্ববর্তী নবীগণ যে স্থানে বাহন বাঁধতেন সেখানে বুরাক বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং সমস্ত নবী ও রাসূলসহ জামায়াতে নামায আদায় করেন। হুযুর (সা.) সে জামায়াতের ইমাম ছিলেন। বায়তুল মাকদিস হতে রাসূলুল্লাহ (সা.) আলমে মুলক ছেড়ে আলমে মালাকুতে উর্ধ্ব হতে উর্ধ্ব চলতে থাকেন।

প্রথম আসমানে পৌঁছলে আসমানের দরজায় নিযুক্ত ফেরেশতা আসমানের দরজা খুলে দিলেন। সেখানে তিনি হযরত আদম (আ.)-এর

সাক্ষাৎ লাভ করেন। হযরত জিবরীল (আ.) উভয়কে পরিচয় করিয়ে দেন। সেখান হতে হুযুর (সা.)-কে নিয়ে তিনি দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছলেন। সেখানে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ হয় এবং সালাম আদান-প্রদানের পর তাঁরা উভয়ে তৃতীয় আসমানে পৌঁছেন এবং সেখানে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। সেখানেও সালাম, জবাব ও দুআ বিনিময় হয়। তারপর চতুর্থ আকাশে পৌঁছে হযরত ইদরীস (আ.)-কে দেখতে পান। পঞ্চম আকাশে পৌঁছে হযরত হারুন (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন। ষষ্ঠ আকাশে গিয়ে হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ এবং নবীজি (সা.) হযরত মুসা (আ.)-কে সালাম করলে হযরত মুসা (আ.) সালামের জবাব দিয়ে দুআ করেন। সেখান হতে সপ্তম আকাশে পৌঁছে দেখতে পান যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) বায়তুল মা'মুরের সাথে ঠেস লাগিয়ে বসে আছেন।

কাবা ঘর বরাবর বায়তুল মা'মুর ফেরেশতাগণের মসজিদ। প্রতিদিন ৭০,০০০ ফেরেশতা উক্ত ঘর তাওয়াফ করেন। যারা একবার তাওয়াফ করে চলে যান তারা কিয়ামত পর্যন্ত আর ফিরে আসেন না। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হুযুর (সা.) খুব সম্মানের সাথে সালাম করেন। সপ্তম আকাশ হতে সিদরাতুল মুত্তাহায় গিয়ে পৌঁছলেন (সিদরাতুন অর্থ: বৃক্ষ এবং মুত্তাহা অর্থ: সীমান্ত, অর্থাৎ সীমান্তের কুলবৃক্ষ)।

হুযুর (সা.) সেখানে কুলবৃক্ষের নীচে ৪টি নহর দেখতে পান। দুটি বাইরের দিকে এবং দুটি ভেতরের দিকে প্রবাহিত। ভেতরের দিকের দুটি বেহেশতে চলে গেছে এবং বাইরের দিকের দুটির নাম ফুরাত ও নীল।

সিদরাতুল মুত্তাহা বা সীমান্তের কুলবৃক্ষ এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এটি কিরামুন কাতিবীন ও অন্যান্য ফেরেশতাগণের দাঁড়ানোর স্থান। জমিন হতে যেসব আমল উন্নীত হয় এবং আল্লাহ তাআলার নিকট হতে যেসব হুকুম নাযিল হয় তাদের সবগুলোর প্রাপ্তসীমা এ বৃক্ষ সিদরাতুল মুত্তাহা। এখান থেকে ফেরেশতাগণ আল্লাহর হুকুম-আহকাম নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। রাসূল করীম (সা.) ব্যতীত আর কোনো ফেরেশতা বা নবী এ স্থান অতিক্রম করতে পারেননি আর পারবেনও না।

সিদরাতুল মুত্তাহা পার হয়ে এক বিশাল পর্দার নিকট পৌঁছে হযরত জিবরীল (আ.) হুযুর (সা.)-এর নিকট আরজ করলেন যে, এটি আমার শেষ সীমা। এখন শুধু আপনি ও আপনার প্রভু। এ স্থান হতে যদি আমি একচুল পরিমাণও অগ্রসর হই তাহলে আল্লাহ তাআলার নূরের তাজাল্লীতে আমি জ্বলে

যাব। এরপর নবীজী (সা.) বুরাক ছেড়ে দিলেন। তার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার তরফ হতে রফরফ নামক বাহন হুযুর (সা.)-এর পদতলে এসে পড়ে। তিনি তার ওপর আরোহণ করে এক সমতল মাঠ অতিক্রম করার পর একে একে ৭০ হাজার নূরের পর্দা অতিক্রম করে (এক পর্দা হতে আর এক পর্দার দূরত্ব ৫ শত বছরের রাস্তা) একেবারে নির্জনে গিয়ে পৌছেন।

হাবীবে খোদা (সা.) আল্লাহ তাআলার জালালীতে নির্জনতায় কিছুটা ভীত হয়ে পড়লে ঠিক তখনই হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি যেন বলছেন, দাঁড়ান, আপনার প্রভু সালাতে মশগুল আছেন।' একথায় তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে দুটি বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। একটি হচ্ছে, হযরত আবু বকর (রাযি.) কিভাবে এখানে আসতে পারেন? আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বেনিয়ায় তিনি কি প্রকারে সালাতে মশগুল থাকতে পারেন? হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কণ্ঠস্বর শুনে হুযুর পাক (সা.)-এর মন শান্ত হল এবং শুনতে পেলেন, হে প্রিয়তম এস, আরও নিকটে এস। তিনি আল্লাহ আরশের নিকট উপনীতি হলেন এবং আল্লাহর এত নিকটবর্তী হলেন যে, দুটি ধনুকের মতো মিলে গেলেন। এমনকি যেন দুটি ধনুকের মাঝে মাত্র একটা রশির ব্যবধান রইল। যেমন- কুরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে,

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ

‘হাবীবে খোদা! আল্লাহর অতিকাছে পৌছলেন। এমনকি তাঁদের উভয়ের মধ্যে দু’ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা আরও সন্নিবর্তী হয়েছিলেন।’^১

নবীজী (সা.) আল্লাহর দরবারে পৌছে অতিনম্রভাবে শির নোইয়ে এই কালিমা পড়ে সিজদা করলেন,

«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ».

‘যবানী, বদনী ও মালী সমস্ত ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্দিষ্ট।’

জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন,

«السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ».

‘হে নবী। আপনার ওপর শান্তি, দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।’

নবীয়ে দু'জাহান (সা.) আল্লাহ তাআলার সালাম কবুল করে আপন উম্মতকেও আল্লাহ তাআলার সালামে শামিল করে আবার বললেন,

«السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ».

‘আমাদের ওপর এবং আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের ওপর তাঁর মহাশান্তি বর্ষিত হোক।’

নবীজি (সা.)-এর দেওয়া, আল্লাহর দেওয়া, আবার নবীজি (সা.) ও উম্মতগণের পাওয়া এ মহাঅভিবাদন ও সালাম এবং প্রতি সালাম শুনে ফেরেশতাকুল বলে উঠলেন,

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।’^১

আল্লাহ তাআলার আরশের নূর রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তবুও তিনি সবকিছু দেখতে পেলেন। আল্লাহ পাক যে দূরত্বে আছেন নবী করীম (সা.) সে দূরত্বেই তাঁকে দেখতে পেলেন। যেমন- হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيْتُ رَبِّي ﷻ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘আমি আমার মহিম্মান্বিত মহাপরাক্রমশালী প্রতিপালককে দেখতে পেয়েছি।’^২

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আল্লাহর একমাত্র হাবীব বা পিয়ারা দোস্ত, তাঁর নিকট আল্লাহ পাক নিজের আত্ম প্রকাশ করার জন্যই তিনি আরশের ওপর বা যেখানে তিনি আছেন এ অলৌকিক অদ্বিতীয় স্থান মহাসমারোহে তাঁকে ডেকে নেন এবং হাবীব ও মাহবুবের সে নিগূঢ় প্রকৃত সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটান। আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টির নিকট নিজের পরিচয় এতটুকু দিয়েছেন সে যতটুকু তারা তাদের সীমিত জ্ঞানে উপলব্ধি করতে পারে। তিনি কারও নিকট আত্মপ্রকাশ করেননি, বরং আত্মগোপন

^১ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৪২৫

^২ (ক) ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৭, পৃ. ৪১৭; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪, পৃ. ৩৫১, হাদীস: ২৫৮০

৫৩ পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ

করেই আছেন। কিন্তু মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীবের নিকট সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

এছাড়া হুযুর (সা.) আল্লাহ তাআলার তরফ হতে বহু নিয়ামত লাভ করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

‘তোমাকে খলীল ও হাবীব করলাম। তোমাকে সমস্ত মানবের প্রতি দোষখের ভয়প্রদর্শক ও বেহেশতের সুসংবাদ বাহক করে প্রেরণ করেছি, তোমার বক্ষ সম্প্রসারণ করেছি, তোমার যিকরকে বুলন্দ করেছি, যখনই আমার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাআলা ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ নেই, আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল আমি তাঁদেরকেও ক্ষমা করে দেই। আমি তোমাকে সৃষ্টিতে সর্বপ্রথম, প্রেরণে সর্বশেষ এবং রোয কিয়ামতে সর্বপ্রথম করেছি। তোমাকে কাওসারের মালিক বানিয়েছি। তোমার উম্মতের জন্য রহমতের ধরা বর্ষণ করব। তাদের প্রার্থনা মন্যুর করব। তাদের পাপ দুনিয়াতে গোপন রাখব। আমার ওপর যে ভরসা করবে আমি তার জন্য যথেষ্ট হবো।’

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُعْطِيتُ ثَلَاثًا: أَنْتَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ».

‘হযরত আস'আদ ইবনে যুরারা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘আমাকে ৩টি সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে; ১. সাইয়িদুল মুরসালীন (রাসূলদের সরদার), ইমামুল মুত্তাকীন (মুত্তাকিদের ইমাম) ও ৩. কায়িদুল গুররিল মুহাজ্জিলীন (আলোকিত চেহারাধারীদের নেতা)।’

মি'রাজের হুযুর (সা.) আরও বহুবিধ নিয়ামত লাভ করেন এবং বহু আশ্চর্য নিদর্শন, দোষখের ভয়বহ প্রকৃতি, বেহেশতের অনুপম সুখ-শান্তি ইত্যাদি দেখেছিলেন।

মি'রাজ শরীফের রাতে পাঞ্জিগানা নামায ফরয করা হয়। প্রথমে হুযুর (সা.) দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামায আদায় করার আদেশপ্রাপ্ত হন। আল্লাহ তাআলার দরবার হতে ফেরার পথে ৬ষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা (আ.)-এর

পরামর্শে আল্লাহর দরবারে পুনঃপুনঃ ৫বার প্রার্থনা করলেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা দৈনিক ৫ বার নামায আদায়ের ফরযিয়ত বহাল রাখেন।

অচিন্তিনীয় দূরত্ব অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিমিষের মধ্যে মক্কায় হযরত উম্মে হানী (রাযি.)-এর ঘরে ফিরে আসলেন।

হুযুর (সা.) বলেছেন, 'আমি বুঝেছিলাম, আর কাবার প্রতি দৃষ্টি করতে যে সময় লাগে তারও কম সময়ের মধ্যে ফিরে আসলাম।'

বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এ সময়ের মধ্যে হুযুর (সা.) লক্ষ বছরের রাস্তা অতিক্রম করেছিলেন। সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ পাকের অলৌকিক ক্ষমতা বলে এটি অসম্ভবের কিছু নয়। কেননা সমস্ত আসমান-জমিনের চাবিকাঠি আল্লাহর নিকটেই। তিনিই সবকিছুর মালিক, তাই ٱلْمَلِكُ (তিনি যা চান তাই করতে পারেন)।^১ দুনিয়ার সবকিছু একই অবস্থায় রেখে হাজার হাজার বছর অতিবাহিত করাতে পারেন এবং এটি কেউ অনুভব করতে না পারা বিচিত্রের কিছুই নয়। মি'রাজের ঘটনাবলি আল্লাহর খাস হাবীব দ্বারা প্রকাশিত মু'জিযারূপে সংঘটিত হয়েছিল এবং এটি চিরস্মরণীয় হয়েছে।

হুযুর (সা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী মি'রাজ স্বশরীরেই হয়েছিল। যদিও কিছু লোক অজ্ঞতাবশত স্বশরীরে মি'রাজ গমনের কথা অবজ্ঞা করে থাকে এতে কিছুই আসে যায় না।

অধুনা বিজ্ঞানীরা বুঝেছে ও বিজলীর ওপর গবেষণা করেই গ্রহ উপগ্রহে পৌঁছতে কৃতকার্য হয়েছে। এতে হুযুর (সা.)-এর স্বশরীরে মি'রাজ গমনের ঘটনা দিবলোকের ন্যায় প্রমাণিত হয়েছে। এর ওপর বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তি বর্তমানে পাওয়া যায় যা অতিসহজে অনুধাবনযোগ্য।

মি'রাজের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

মি'রাজ শুধু ভ্রমণ ও নিদর্শন সর্বস্ব নয়। এটি নবী করীম (সা.)-এর নিকট জাতির কল্যাণমূলক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদানের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে বিশেষ ব্যবস্থা। এক বিশেষ পরিস্থিতিতেই হুযুর (সা.)-কে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে আহ্বান করা হয়েছিল।

মানুষ কোনো কিছু দেখতে চাইলে তাতে ৩টি শর্ত পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকতে হবে। যথা—

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বুরূজ, ৮৫:১৬

৫৫ পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ

১. বস্তু হতে বিচ্ছুরিত আলো চোখে পড়তে হবে ।
২. আলো চোখে পড়ার পর চোখ বন্ধ না হয়ে খোলা থাকতে হবে ।
৩. দেখার সময় জ্ঞান অটুট থাকতে হবে ।

তাই আল্লাহ পাক আসমান হতে জিবরীল (আ.) দ্বারা বেহেশতী পোশাক পাঠিয়ে ছ্যুর পাক (সা.)-এর দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিকশক্তি এমনভাবে দান করেছিলেন যেন তিনি আল্লাহ তাআলার নূর ও অলৌকিক নিদর্শনাবলি স্বচক্ষে দেখতে পারেন । আল্লাহ তাঁকে সপ্তআকাশ পরিভ্রমণ করিয়ে আপন সান্নিধ্য দান করেছিলেন । স্বয়ং হযরত জিবরীল (আ.) যে উর্ধ্বসীমা অতিক্রম করার অধিকার পাননি মহানবী (সা.) তাও অতিক্রম করেছিলেন ।

স্বশরীরে মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার ওপর বর্তমানে বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় । অতিসহজে অনুধাবনের জন্য নিম্নে সামান্য এবং সহজতর উদাহরণ দেওয়া হল ।

কোন মানুষ মহাশূন্যে যেতে চাইলে তার জন্য বেশি শক্তিসম্পন্ন যানের প্রয়োজন । আমরা দেখি বা জানি, বর্তমান যুগে নবযান কিংবা রকেটের সাহায্যে চন্দ্র ও মঙ্গলগ্রহে মানুষ পৌঁছেছে । সেজন্য ওই সময় মানুষকে বিশেষ পোশাক পরিধান করতে হয় । তাই দেখা যায় আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য বেহেশতী পোশাক পাঠিয়েছিলেন । যার সাহায্যে মহাশূন্যের বিভিন্ন তীক্ষ্ণ আলোকরশ্মির প্রভাব হতে তাঁর পক্ষে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়েছিল ।

চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজি পার হয়ে যেতে হলে আলো হতেও গতিসম্পন্ন বাহনের প্রয়োজন, ছ্যুর (সা.) বুরাক নামক এক অলৌকিক বাহনে চড়ে মি'রাজ গমন করেছিলেন । আরবিতে بُرَاق (বারকুন) অর্থ: বিদ্যুৎ বা বিজলী । দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়া কারণে এর বুরাক নামে অভিহিত করা হয়েছে । সুতরাং বিশেষ পোশাক পরিধান করে অতিগতিসম্পন্ন বাহনে চড়ে নবী করীম (সা.) মি'রাজে গমন করেছিলেন । প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা জড়দেহী মানুষ কিছুতেই মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে মাহকাশ ভ্রমণ করতে পারে না বলে মি'রাজের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত করেছিল । আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছেন, শূন্যের কোনো স্থল বস্তু পৃথিবীকে সবসময় সমভাবে আকর্ষণ করে না । পৃথিবীর যেমন আকর্ষণশক্তি আছে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহেরও তেমনি আকর্ষণ শক্তি রয়েছে ।

গতিবিজ্ঞান স্থির করেছে যে, যদি কোনো জড়পদার্থ প্রতি সেকেন্ডে ৭ মাইল বেগে উর্ধ্ব নিষ্ক্ষেপ করা হয় তবে তা মধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে

পুনঃপ্রত্যাবর্তনশীল থাকে না। অনুরূপভাবে পৃথিবীর কোনো বস্তু যতই উর্ধ্বগামী হবে ততই তার ওজন কমতে থাকবে।

যেমন— বিজ্ঞানী আর্থার জি. ক্লার্ক বলেছেন, ‘পৃথিবী হতে যতই উর্ধ্ব যাবো যাব ততই ওজন কমে যাবে।’ অবশেষে তার আকর্ষণশক্তি মোটেই বোঝা যায় না। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটিকে অবশেষে ‘ওজন শূন্য’ বলে অভিহিত করেছেন। অতএব মধ্যাকর্ষণ যুক্তি দ্বারা মি'রাজের ঘটনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হুয়ুর (সা.) মি'রাজ পরিভ্রমণ করে ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, যাত্রাকালে হযরত উম্মে হানী (রাযি.)-এর ঘরে যে স্থানে অয়ু করেছিলেন সে স্থানে অয়ুর পানি এখনও গড়িয়ে যাচ্ছে, আর যে বিছানায় তিনি শুয়েছিলেন তা তখনও গরম। এটি কি করে সম্ভব?

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই এটি সহজে অনুধাবনযোগ্য। যেমন— আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ঢাকায় আসার প্রোগ্রাম করেছেন। একথা শোনামাত্র বাংলাদেশ সরকার উক্ত প্রেসিডেন্টের সম্মান ও নিরাপত্তার জন্য ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন পর্যন্ত সেই বিশেষ সময়ের জন্য রাস্তাগুলোর যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিলেন। নির্ধারিত সময়ের পর আবার সেসব রাস্তাগুলির চলাচল শুরু করার আদেশ হয়ে যাবে। এটি দুনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মানে করা হয়। তাহলে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক তাঁর একমাত্র হাবীব যাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতেন না তাঁকে যখন নিজ দরবারে ডেকেছেন যাত্রাপথে তিনি যদি তাঁর বন্ধুর সম্মানে সময়ের গতি একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য বন্ধ করে থাকেন আর রাসূল করীম (সা.) তাঁর এ দীর্ঘ সফর শেষ করে ঘরে ফিরে অয়ুর পানি গড়াতে দেখেন তাহলে আশ্চর্য বা বিস্ময়ের কিছুই থাকতে পারে না।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ মি'রাজের ঘটনার প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা তাদের মতে মি'রাজ অনেক অজানা পথের সন্ধান দিয়েছে। যাতে মানুষ অনেক গোপন স্থানে পৌঁছার প্রয়াস পেয়েছে। দূরকে নিকটে, অজয়কে জয় করার পথ মুক্ত করে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ মি'রাজের ওপর গবেষণা করে বর্তমানে পৃথিবী হতে ৯ (নয়) আলোক বছর দূরের ‘সাইরিয়াস’ গ্রহে স্বশরীরে ভ্রমণ করে ১২/১৩ ঘণ্টার মধ্যে যাত্রাস্থানে ফিরে আসার অভিযানকে সম্ভব করে তুলেছে। ১ আলোক বছর ৬ লক্ষ কোটি মাইল। ৯ আলোক বছরে ৫৪ লক্ষ কোটি মাইল। সাধারণ মানুষের পক্ষে যখন এ ধরনের অভিযান ও

৫৭ পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ

পরিভ্রমণ সম্ভব হয়ে গেল তখন যাঁর উসিলায় এ বিশ্ব সৃষ্টি এবং যিনি সৃষ্টির সেরা তাঁরা জন্য সহজ হতে সহজতর হওয়া এবং হুযুর (সা.) স্বশরীরে মি'রাজ যাওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয় ও দ্বিধা থাকতে পারে না এবং প্রত্যেক উম্মতে মুহাম্মদী (সা.)-এর অন্তরে এর প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে ।

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ॥

১. আল-কুরআন আল-করীম

২. আহমদ ইবনে হাম্বল

: আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), আল-মুসনদ, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ই॥

৩. ইবনুল আ'রাবী

: আবু সাঈদ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ ইবনে বিশর ইবনে দিরহাম = ইবনুল আ'রাবী আস-সূফী (২৪৬-৩৪০ হি. = ৮৬০-৯৫২ খ্রি.), মু'জামুশ শূখ, দারু ইবনিল জাওয়ী, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

৪. ইবনুল জাওয়ী

: আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জাওয়ী (৫০৮-৫৭৯ হি. = ১১১৬-১২০১ খ্রি.), যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর, দারুল কিতাব আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

৫. ইবনে আবু হাতিম

: আবু মুহাম্মদ, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল মুনিযির আত-তামীমী আল-হানযালী আর-রাযী (২৪০-৩২৭ হি. = ৮৫৪-৯৩৮ খ্রি.), তাফসীরুল কুরআনিল

৫৯ পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ

আযীম, মাকতাবাতু নিয়ার মুস্তাফা আল-বায়, মক্কা মুকাররমা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

৬. ইবনে ইসহাক

: মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার আল-মুত্তালিবী আল-মাদানী (০০০-১৫১ হি. = ০০০-৭৬৮ খ্রি.) আস-সিয়ার ওয়াল মাগাযী, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৮ হি. = ১৯৭৮ খ্রি.)

৭. ইবনে কসীর

: আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১-৭৭৪ হি. = ১৩০২-১৩৭৩ খ্রি.), তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৮. ইবনে মাজাহ

: ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯-২৭৩ হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), আস-সুনান, দারুল ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান

॥৩॥

৯. আল-ওয়াহিদী

: আবুল হাসান, আলী ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-ওয়াহিদী আন-নায়সাবুরী আশ-শাফিঈ (০০০-৪৬৮ হি. = ০০০-১০৭৬ খ্রি.), আসবাবু নুযূলিল কুরআন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

॥ক॥

১০. আল-কুরতুবী

: আবু আবদুল্লাহ, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-আনসারী আল-খায়রাজী আল-কুরতুবী (৬০০-৬৭১ হি. = ১২০৪-১২৭৩ খ্রি.) আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. = ১৯৬৪ খ্রি.)

॥জ ॥

১১. আল-জিলানী

: মুহুউদ্দীন, আবু মুহাম্মদ, আবদুল কাদির ইবনে মুসা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জঙ্গিদোস্ত আল-হুসাইনী আল-জীলানী/আল-কীলানী/আল-জীলী (৪৭১-৫৬১ হি. = ১০৭৮-১১৬৬ খ্রি.), আল-গুনয়াতু লি-তালিবায় তরীকিল হক আয্যা ওয়া জাল্লা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

॥ত ॥

১২. আত-তাবারী

: আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে জরীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালিব আত-তাবারী (২২৪-৩১০ হি. = ৮৩৯-৯২৩ খ্রি.), জামিউল বায়ান ফী তাওয়ালিল কুরআন, দারু হিজর, কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

॥ব ॥

১৩. আল-বাগাবী

: রুকনুদ্দীন, মুহয়িউস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মদ, আল-হুসাইন ইবনে মাস'উদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল ফাররা আল-বাগাবী আশ-শাফিয়ী (৪৩৬-৫১০ হি. = ১০৪৪-১১১৭ খ্রি.), মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান (১৪২০ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

১৪. আল-বায্যার

: আবু বকর, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালিক ইবনে খাল্লাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আতাকী আল-বায্যার (১০০-২৯২ হি. = ১০০-৯০৫ খ্রি.), আল-মুসনদ = আল-বাহরুয যাখ্খার, মকতবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪-১৪২৯ হি. = ১৯৮৮-২০০৯ খ্রি.)

৬১ পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজ

১৫. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), **শুআবুল ঈমান**, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)
১৬. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), **আদ-দা'ওয়াতুল কবীর**, গিরাস লিন-নাশর ওয়াত-তাওয়া', কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)
১৭. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), **আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ**, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

॥ম ॥

১৮. মুজাহিদ : আবুল হাজ্জাজ, মুজাহিদ ইবনে জাবর আত-তাবিয়ী আল-মক্কী আল-কুরাশী আল-মাখযুমী (২১-১০৪ হি. = ৬৪২-৭২২ খ্রি.), **তাফসীরুল কুরআনিল আযীম**, দারুল ফিকর আল-ইসলামী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৭৯ খ্রি.)
১৯. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নাযশাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), **আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু**

পবিত্র শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মিরাজ ৬২

আলায়হি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ, দারু
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত,
লেবনান

॥শ॥

২০. মুফতী মুহাম্মদ শফী: মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুরআন*, খাদিমুল
হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প,
মদীনা শরীফ, সউদী আরব

॥স॥

২১. আস-সুয়ুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান
ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হি.
= ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *আল-খাসায়িসুল কুবরা*,
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান
২২. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী : মাওলানা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী
আল-উসমানী আল-মাযহারী (১১৪৩-১২২৫
হি. = ১৭৩০-১৮১০ খ্রি.), *আত-তাফসীরুল
মাযহারী*, মকতাবায়ে রশিদিয়া, করচি,
পাকিস্তান (১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

॥হ॥

২৩. আল-হায়সামী : আবুল হাসান, নুরুদ্দীন, আলী ইবনে আবু
বকর ইবনে সুলায়মান আল-হায়সামী আল-
কাহিরী আল-মিসরী (৭৩৫-৮০৭ হি. =
১৩৩৫-১৪০৫ খ্রি.), *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া
মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, মাকতাবাতুল কুদসী,
কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)